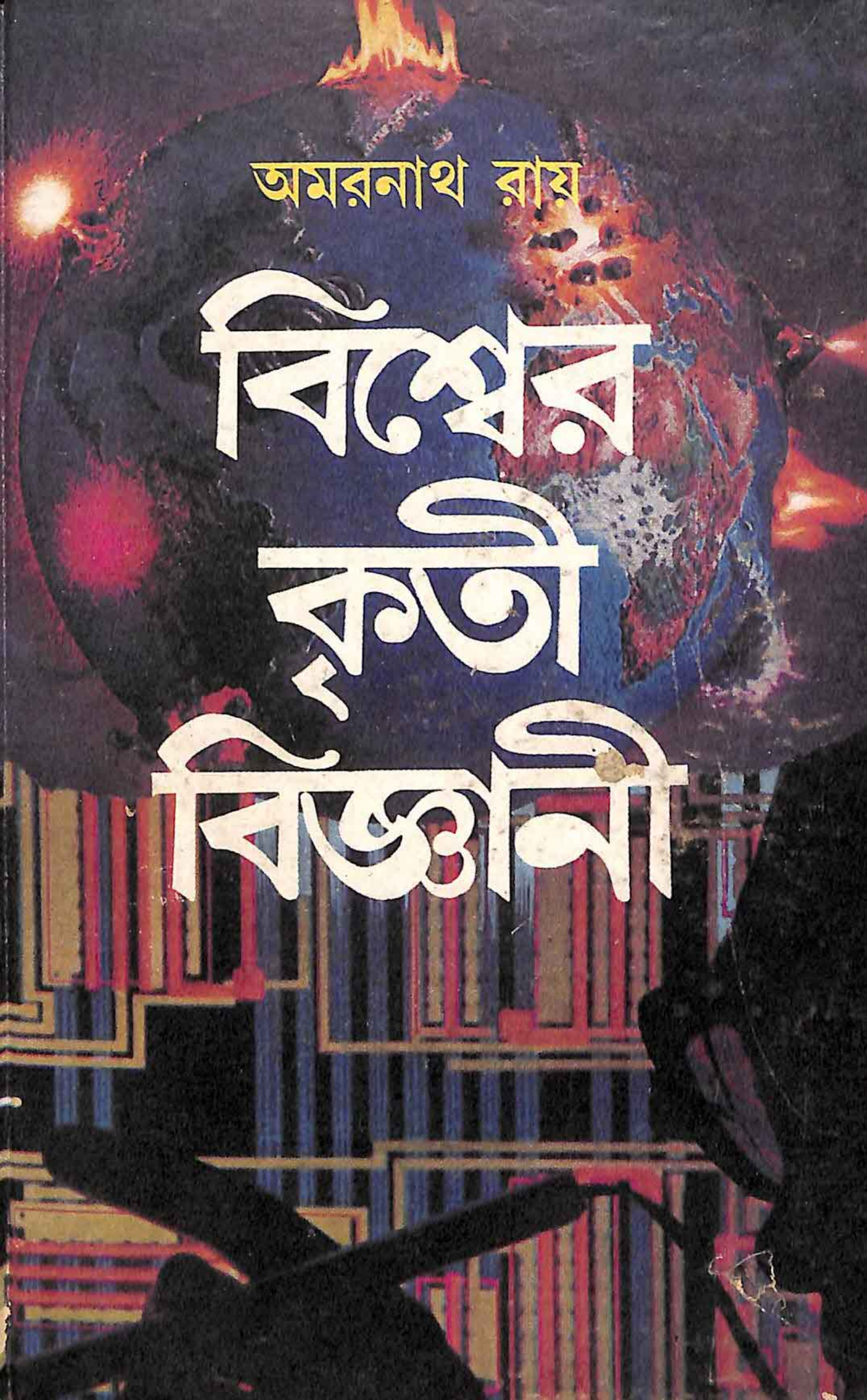
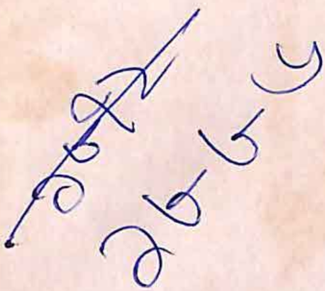

অমরনাথ রায়
বিশ্বের
কৃতী
বিজ্ঞানী



বিশ্বের কৃতী বিজ্ঞানী

বিশ্বের কৃতী বিজ্ঞানী

অমরনাথ রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—আশ্বিন, ১৩৯৭
—সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

প্রকাশক :
শ্রীসুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
দিপালী হাটাই
নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম : কুড়ি টাকা
Rupees Twenty only

উৎসর্গ

পুত্র বিবেক ও বৌমা প্রতিমার
হাতে স্নেহভরে তুলে দিলাম।
—বাবা।

লেখকের অন্যান্য বই

বিশ্বের বিজ্ঞানী

রসায়নের রসালো গল্প

বিচিত্র বিজ্ঞান

রসায়ন ভারতী

সূচীপত্র



টাইকো ব্রাহে
(1546—1601)

টাইকো ব্রাহে ছিলেন এক বিখ্যাত ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপযোগী অনেক যন্ত্রপাতির উন্নতি বিধান করেছিলেন এই মানুষটি। অনেক গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান তিনি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলীতে কয়েকটি নতুন তারা আবিষ্কার করেছিলেন।

ডেনমার্কের এক গ্রামে 1546 সালে টাইকোর জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম টাইগি (Tyge), ল্যাটিন ভাষায় তা রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় 'টাইকো'-তে। টাইকো ছিলেন এক অবস্থাপন্ন জমিদারের ছেলে। তাঁর কাকা জর্জ ব্রাহে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু নিঃসন্তান বলে টাইকোকে তিনি দত্তক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। টাইকোকে উচ্চ শিক্ষিত করে তোলায় তিনি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। সেই মতো ব্যবস্থাও করেছিলেন।

মাত্র সাত বছর বয়সে টাইকো ল্যাটিন ভাষা শিখে ফেলেন। শুধু তাই নয়, ল্যাটিন ভাষায় তিনি অনর্গল কথা কইতে এবং কবিতা ও গান রচনা করতে পারতেন। বারো বছর বয়সে পালক-পিতা জর্জ ব্রাহে টাইকোকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সেখানে টাইকো আইন ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন।

এই বয়সে টাইকো জ্যোতিষ শাস্ত্রেও আগ্রহী ছিলেন। সেই সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর অনুরাগ জন্মে। 1560 সালের আগস্ট মাসের কথা। কয়েকজন দিনেমার জ্যোতির্বিজ্ঞানী তখন সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। গ্রহণের দিন-ক্ষণও আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছিলেন। টাইকো গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। জ্যোতিষীদের কথা মতো নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়েই সেই সূর্যগ্রহণ ঘটে। তা দেখে আরও অবাক হন টাইকো। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দারুণ বেড়ে যায়। তখনই বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমির লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বইখানির ল্যাটিন অনুবাদ করে ফেলেন তিনি।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে টাইকো ব্রাহে এবারে লিপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের জন্যে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার দিনের সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পড়াতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টাইকোর হাতেখড়ি হয় তাঁদের কাছেই।

তখনকার দিনে আকাশ পর্যবেক্ষণের কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ছিল না। এই বিদ্যাটির সঙ্গে অনেক পৌরাণিক কাহিনী ও কুসংস্কারও জড়িত ছিল। টাইকো সে সব বিশ্বাস না করে নিজের চেষ্টায় এক নির্দিষ্ট উপায়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যান। বলতে গেলে এ কাজে তিনি গতানুগতিকতাকে বর্জন করে নিজস্ব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পদ্ধতি ছিল অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত।

জর্জ ব্রাহে মারা গেল পর টাইকো তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হন

বাজে কাজে অর্থব্যয় না করে তিনি কোয়াড্রান্ট, সেক্সটান্ট প্রভৃতি যন্ত্র নির্মাণে ও তাদের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন ও অর্থব্যয় করতে থাকেন।

সতের বছর বয়স থেকেই টাইকো ব্রাহে আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলেন। নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ফলাফল তিনি একটি খাতায় লিখে রাখতেন। বার বার পর্যবেক্ষণ কার্য চালিয়ে যতদূর সম্ভব নিখুঁত ফলাফল সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক থাকতেন। সে সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। তবুও অভিনব পদ্ধতিতে প্রচলিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই টাইকো গ্রহ-তারকা ও নক্ষত্ররাজির অবস্থান এমন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন যে তা আজকের দিনে ভাবলেও অবাক হতে হয়। কতো সময়ে এক বছর হবে তাও তিনি প্রায় নির্ভুলভাবেই গণনা করেছিলেন। তাঁর এ গণনায় ভুল হয়েছিল মাত্র এক সেকেণ্ডের !

সে যুগে কোন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে বিবাদ হলে তার মীমাংসা হতো দ্বৈত লড়াইয়ের মাধ্যমে। একবার এমনি এক বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানের লড়াইয়ে লিপ্ত হ'য়ে টাইকোর নাক কাটা গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি ধাতু দিয়ে কৃত্রিম নাক গড়িয়ে তা পরে ঘুরে বেড়াতেন। টাইকোর মৃত্যুর পর তাঁর গড়া মানমন্দির দেখতে গিয়ে দর্শকেরা যত না আগ্রহী হতেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দর্শনে, তার চেয়ে বেশী আগ্রহী হতেন টাইকোর ব্যবহৃত ধাতব নাকটি দর্শনে !

1572 সালের নভেম্বর মাসে টাইকো মহাকাশে একটি নতুন তারা দেখেন। তারাটি বেশ উজ্জ্বল। সেটি বোমার মত বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের পর তারাটির ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, কিন্তু দেড় বছর বাদেই সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। টাইকো ঐ তারাটিকে 'নোভা' আখ্যা দেন। 'নোভা' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখে তিনি সেটি প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি 'নোভা' সম্পর্কিত বক্তৃতা দিতেন, তখন প্রচুর শ্রোতা সমাগম হতো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে টাইকো ব্রাহের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডেনমার্কের তৎকালীন রাজা ফ্রেডারিক-II খুশী হ'য়ে টাইকোকে কোপেনহেগেনের কাছে ভিন (Hveen) নামে একটি দ্বীপ দান করে যান। টাইকো এই দ্বীপে কুড়ি হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে বিরাট একটি মানমন্দির গড়ে তোলেন। বলা বাহুল্য, এই বিপুল অর্থও রাজা ফ্রেডারিক-II টাইকোকে দান করেছিলেন—ঐ মহৎ প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার জন্যে। টাইকো তাঁর

প্রতিষ্ঠিত মান মন্দিরের নাম দেন ইউরেনিয়েনবর্গ' অর্থাৎ কিনা 'স্বর্গের দুর্গ'। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই মানমন্দিরটি দেখতে আসতেন। তাঁরা মানমন্দিরের অভিনব যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির সাহায্যে মহাকাশে নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখে বিস্মিত হতেন।

1592 সালে রাজা ফ্রেডারিক-II মারা গেলে পর সরকারী নির্দেশে টাইকোর সম্পত্তি ক্রোক করা হয় এবং তাঁর চারশো পাউণ্ড বাৎসরিক পেনসনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে তখন টাইকোকে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ এবং রুজি রোজগারের চিন্তা করতে হয়।

তখন জার্মানীর সম্রাট ছিলেন রুডলফ II; জ্যোতির্বিজ্ঞানে টাইকোর পাণ্ডিত্যের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। তিনি এই দুঃসময়ে টাইকোকে তাঁর দেশে নিয়ে যান। 1599 সালে টাইকো যান প্রাগে। সেখানে জার্মান সম্রাট টাইকোর জন্যে সুন্দর একটি মানমন্দির গড়িয়ে দেন এবং তার সর্বময় কর্তারূপে টাইকোকে নিযুক্ত করেন। টাইকো সেখানে মোটা অঙ্কের বেতন পেতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্ররা দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসতো জ্ঞানার্জনের জন্যে। এমনি এক ছাত্র 'কেপলার' কে টাইকো ব্রাহে সহকারী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। প্রাগের এই মানমন্দিরে গবেষণা-কালেই টাইকো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন এবং সেটির নাম দেন 'রুডলফিন টেবল্স'। বলা বাহুল্য, এই নাম-করণের উদ্দেশ্য—মহানুভব জার্মান সম্রাট রুডলফ-II এর নামকে স্মরণীয় করে রাখা।

1601 সালে এই কৃতী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইহলোক ত্যাগ করেন কিন্তু আজকের দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও সশ্রদ্ধ চিত্তে টাইকো ব্রাহেকে স্মরণ করেন।



জোহান রুডল্‌ফ গ্লবার

(1604 – 1670)

স্কুলে রসায়ন বিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছে যারা, তারা সবাই 'গ্লবার লবণ' নামটির সঙ্গে পরিচিত। রসায়নের ভাষায় 'গ্লবার লবণ' হলো 'সোদক সোডিয়াম সালফেট'। এই যৌগটির আবিষ্কর্তার নাম 'জোহান রুডল্‌ফ গ্লবার'। 'গ্লবার লবণ' নামটির মধ্যে দিয়ে এই রসায়ন বিজ্ঞানীকে চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

গ্লবার ছিলেন একজন খ্যাতনামা জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি অনেকগুলি অ্যাসিড, ধাতব ক্লোরাইড, নাইট্রেট, সালফেট ও অ্যাসিটেট লবণ প্রস্তুত করেই ক্ষান্ত হয় নি, নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলির ধর্মও অনুধাবন করে গেছেন।

1604 খ্রীস্টাব্দে ব্যাভেরিয়ায় জন্ম হয় গ্লবারের। তাঁর বংশ পরিচয়

উল্লেখযোগ্য নয়। সামান্য এক নাপিতের ছেলে ছিলেন তিনি। উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্গতি ছিল না তাঁর। ছিল কেবল জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা। তখনকার দিনে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব পত্র-পত্রিকা ছিল সেগুলি পড়ে এবং হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। কিমিয়াবিদ্যায় (অ্যালকেমি) বেশ আস্থা ছিল গ্লবারের। পূর্ববর্তী কিমিয়াবিদ্‌দের গোপন সংকেত লিপি অনুসরণ করে তিনি ওষুধপত্র বানাতেন এবং তা বিক্রী ক'রে অর্থোপার্জনও করতেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যেও কিমিয়াবিদ্‌দের নানাবিধ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্লবার-এর প্রখর পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল আর ছিল মৌলিক চিন্তাশক্তি। বংশগৌরব ও আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন ধৈর্য, অধ্যবসায় ও প্রবল জ্ঞানস্পৃহার জন্যে। হাতে কলমে কাজেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। আর এই পারদর্শিতার জন্যেই তিনি 'রসায়ন শিল্পের জনক' আখ্যা লাভ করেছিলেন।

দেশ-বিদেশে দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়িয়ে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অবশেষে 1655 খ্রীস্টাব্দে গ্লবার চলে আসেন আমস্টারডামে এবং ঘর বেঁধে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অতিবাহিত করেন সেখানে। গ্লবার যে কেবল রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী ও রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা নয়, ভাল লেখকও ছিলেন। অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করে গেছেন। আমস্টারডাম হতেই তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। সাতখণ্ডে রচিত 'অপেরা ওমনিয়া', 'অপেরা কিমিয়া' এবং 'ফার্নি নোভি ফিলজোফিসি' তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

গ্লবার নানান্ ধরনের চুল্লী আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিভিন্ন শিল্পে ঐ চুল্লীগুলির ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে গেছেন। একটি গ্রন্থে তিনি সাধারণ পাতন, স্টীমের সাহায্যে পাতন, ঊর্ধপাতন ইত্যাদি বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্লবার সালফিউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত ক'রে গেছেন। 'অম্লরাজ' বা 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' প্রস্তুতির কৃতিত্বও তাঁরই। কাঠকে পাতিত করে গ্লবার ভিনিগার ও অ্যাসিটোন প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'রাসায়নিক বাগান' তিনিই প্রথম প্রস্তুত করেছিলেন। এ ভিন্ন নানারকম উদ্ভিদকে স্টীমের সাহায্যে পাতিত ক'রে বিভিন্ন গন্ধযুক্ত নির্যাস তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। সিলভার

নাইট্রেট দ্রবণ ব্যবহার ক'রে গ্লবার পালক ও পশমকে রঞ্জিত করার এক বিশেষ উপায়ও উদ্ভাবন করেছিলেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই জার্মান বিজ্ঞানী। 1670 খ্রীস্টাব্দের 10-ই মার্চ তারিখে গ্লবারের জীবনাবসান ঘটে। আজ 'গ্লবার' আমাদের মধ্যে নেই বটে কিন্তু তাঁর কীর্তি তাঁকে রেখেছে অমর করে। কৃতী রসায়ন বিজ্ঞানী রুডল্ফ গ্লবারের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল লেখা রইবে স্বর্ণাক্ষরে। প্রবল জ্ঞানস্পৃহা, অনন্যসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকলে বংশ গৌরব ও আর্থিক সঙ্গতি ব্যতিরেকেও মানুষ যে জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে—গ্লবারের কর্মময় জীবন কাহিনী তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।



রবার্ট বয়েল
(1627—1691)

সকাল আটটার সময় লণ্ডনে রবার্ট বয়েল-এর বাড়ির সামনে কয়েকজন ছুতোর মিস্ত্রী উপস্থিত হয়ে বাড়ীর সদর দরজা খুলে ফেললো। সকাল ন'টায় ঘোড়ায় টানা একটা লম্বা গাড়ী সেই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। চারজন মজুর ঐ গাড়ী থেকে খুব ভালভাবে মোড়ানো প্রায় বারো ফুট লম্বা একটা বস্তুকে অতি সন্তর্পণে নামালো এবং ধরাধরি ক'রে সদর দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতরে বয়ে নিয়ে গেল।

সকাল দশটায় জনৈক কেমিস্টের দোকান থেকে একটি গাড়ী এসে বয়েলের বাড়ীর সদর দরজার পাশে তিনটি ছোট অথচ ভারী পিপা নামিয়ে রেখে গেল।

বয়েলের সহকারীরা ঐ পিপা তিনটি বাড়ীর মধ্যে বয়ে নিয়ে গেল। ছুতোর মিস্ত্রীরা এরপর ঐ বাড়ীর সদর দরজাটা আবার ঠিকভাবে লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। পাড়া-প্রতিবেশীরা ভাবতে লাগলেন—বাড়ীর ভেতরে নিশ্চয়ই কোন বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, এসব তারই প্রস্তুতি।—এ ঘটনা 1662 খ্রীস্টাব্দের।

হ্যাঁ, ঐ বাড়ীর ভেতরে একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারই উদ্যোগপর্ব চলছিল। বয়েল ঐ পরীক্ষার জন্যে ইংরেজী অক্ষর J এর আকৃতি বিশিষ্ট মস্ত বড় একটা কাচনল বানিয়ে এনেছিলেন। ঐ কাচনলের বড় বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল বারো ফুট এবং ছোট বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ ফুট। ছোট বাহুটির শেষ প্রান্তে স্টপ কক্ লাগানো ছিল। কাচনলের বড় বাহুর মুখ ছিল খোলা কিন্তু ছোট বাহুর মুখ ছিল বন্ধ।

কাচনলটিকে বাড়ীর মধ্যে একটা খোলা জায়গায় খাড়াভাবে দাঁড় করানো হলো। দাঁড় করানো হলো একটা চওড়া ধাতব পাত্রের উপর। পারদপূর্ণ পিপা তিনটির মুখ খোলা হলো। রবার্ট বয়েলের একজন সহকারী J নলের লম্বা বাহুর খোলা মুখে একটি বীকারে করে ধীরে ধীরে পারদ ঢালতে লাগলেন। অমনি সেই পারদ নেমে ছোট বাহুর মধ্যে আবদ্ধ বায়ুকে চাপ দিয়ে ক্রমাগত সংকুচিত করতে লাগলো। তার মানে, ছোট বাহুর মধ্যে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। পারদ স্তম্ভ ভেদ ক'রে বায়ু কাচ নলের খোলা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারল না বলে ছোট বাহুর মধ্যে বায়ু পিস্ট ও সংকুচিত হয়ে রইলো পারদের চাপে।—রবার্ট বয়েল এইভাবে প্রমাণ করলেন যে বায়ুকে চাপ প্রয়োগে পিষ্ট ও সংকুচিত করা যায়।

এরপর বয়েল J নলের ছোট বাহুর সঙ্গে সংযুক্ত স্টপ কক্ বা প্যাঁচ কলের মুখ খুলে দিয়ে নলের মধ্যে পারদ ঢালতে লাগলেন। এইভাবে পারদ ঢালতে ঢালতে প্যাঁচকল থেকে শুরু ক'রে পারদ স্তম্ভের উপরতল পর্যন্ত স্থানে 48 ইঞ্চি বায়ুস্তম্ভ পাওয়া গেল। তখন J নলের উভয় বাহুতেই পারদ স্তম্ভের উচ্চতা সমান হলো। তারমানে, তখন J নলের উভয় বাহুর পারদ স্তম্ভের উপর বায়ু-চাপ সমান হলো।

বয়েল বুঝলেন যে, এই 48 ইঞ্চি বায়ুস্তম্ভের চাপ, এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান। এই বুঝে তিনি এরপর প্যাঁচকলটি বন্ধ করে দিলেন। তাঁর সহকারী J নলের বড় বাহুর মধ্যে আরও পারদ ঢালতে লাগলেন। আবদ্ধ বায়ুস্তম্ভ সংকুচিত হয়ে 24 ইঞ্চিতে না দাঁড়ানো পর্যন্ত বয়েলের ঐ সহকারী ক্রমাগত পারদ ঢালতে থাকলেন। বয়েল তখন J নলের লম্বা ও ছোট বাহু দুটির

পারদস্তম্ভের উচ্চতার বিয়োগফল নির্ণয় করলেন। তিনি দেখলেন যে এই দুই পারদস্তম্ভের উচ্চতার পার্থক্য তখন ঠিক $29\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। বয়েল তখন সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই $29\frac{1}{8}$ ইঞ্চি উচ্চতার পারদস্তম্ভই সেই দিনের বায়ুচাপের সমান। এর থেকে বোঝা গেল যে, বয়েলের সহকারী নলে আবদ্ধ বায়ুস্তম্ভের উপর চাপ দ্বিগুণিত ক'রে আবদ্ধ বায়ুর আয়তন অর্ধেক কমিয়েছেন। আরও পারদ ঢেলে বয়েল পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমিয়ে যখন 12 ইঞ্চিতে দাঁড় করালেন, তখন পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উচ্চতার সিকি ভাগ হলো এবং J নলের উভয় বাহুর পারদস্তম্ভের উচ্চতার পার্থক্য দেখা গেল প্রায় 88 ইঞ্চি, যা নাকি বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় চারগুণ বেশী চাপ নির্দেশ করে।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে বয়েল এই পরীক্ষাটি বেশ কয়েকবার করলেন এবং প্রতিবারই একই রকম ফল পেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, গ্যাসের উপর যে অনুপাতে চাপ বাড়ানো যায়, গ্যাসের আয়তনও সেই অনুপাতে কমতে থাকে। পরীক্ষালব্ধ এই ফল থেকে রবার্ট বয়েল যে সূত্রটি আবিষ্কার করলেন, তা 'বয়েলের সূত্র' নামে খ্যাত। বয়েলের সূত্রটি এই রকম: 'স্থির উষ্ণতায় কোন গ্যাসের আয়তন ঐ গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্তানুপাতিক হয়।' তার মানে, স্থির উষ্ণতায় কোন গ্যাসের উপর চাপ দ্বিগুণিত করলে গ্যাসের আয়তন কমে অর্ধেক হয়। চাপ তিনগুণ বাড়ালে গ্যাসের আয়তন কমে এক তৃতীয়াংশ হয়।

1627 সালে আয়ারল্যাণ্ডে রবার্ট বয়েলের জন্ম হয়। তিনি 'আর্ল অফ কর্ক'-এর চতুর্দশতম সন্তান। বাল্যকালে বয়েল অনেকগুলি ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা তো শৈশবেই রপ্ত করেছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে রবার্ট ইংলণ্ডের সেরা প্রিপেয়ারেটরি স্কুল 'ইটন' এ ভর্তি হন। এখানে তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শেখেন। এখানকার পাঠ শেষ করে তিনি অক্সফোর্ডে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে যান। অক্সফোর্ডে তখন বয়েলের সহপাঠী বেশ কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। এঁরা সবাই সত্যানুসন্ধানে পরীক্ষাকার্য চালাতে আগ্রহী ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসও এঁদের সহমতাবলম্বী ছিলেন। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শীঘ্রই ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির গোড়াপত্তন হয়। বয়েলের বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহেই রয়্যাল সোসাইটির সভ্যদের মিটিং হতো। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো, মত বিনিময় হতো।

বয়েল তাঁর বাড়ীতে একটি পরীক্ষাগার নির্মাণ করেছিলেন। রবার্ট হুক

নামে এক প্রতিভাশালী যুবককে তিনি তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ ছিল বয়েলের, আর ছিল মৌলিক চিন্তাধারা। এদিকে রবার্ট হুক ছিলেন কুশলী যন্ত্রবিদ। তিনি বয়েলের চিন্তাধারা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতেন। পারস্পরিক সহযোগিতায় বয়েলের বিজ্ঞান সাধনা এগিয়ে চলতো।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই বয়েলের আগ্রহ ছিল। বায়ু নিয়ে তিনি বেশ কিছুকাল গবেষণা চালান। তিনি 'অটো ভ্যান গুরিকের' বায়ু-পাম্পের উন্নতিবিধান করেন। সেই উন্নত বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে বয়েল প্রমাণ করেন যে, শব্দ-শক্তি বায়ু মাধ্যমে চলাচল করে।

পরবর্তী জীবনে বয়েল বিজ্ঞানের যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে সাফল্য লাভ করেন, সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো।

(i) বয়েলই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি বলেছিলেন যে, অণুর গতির জন্যেই তাপ উৎপন্ন হয়।

(ii) সম্ভবত তিনিই প্রথম রসায়ন বিজ্ঞানী, যিনি পরীক্ষাকার্য চালাবার জন্যে গ্যাস সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

(iii) তিনি বলেছিলেন যে, বায়ুকে অনেকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বায়ু একাধিক গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণে গঠিত।

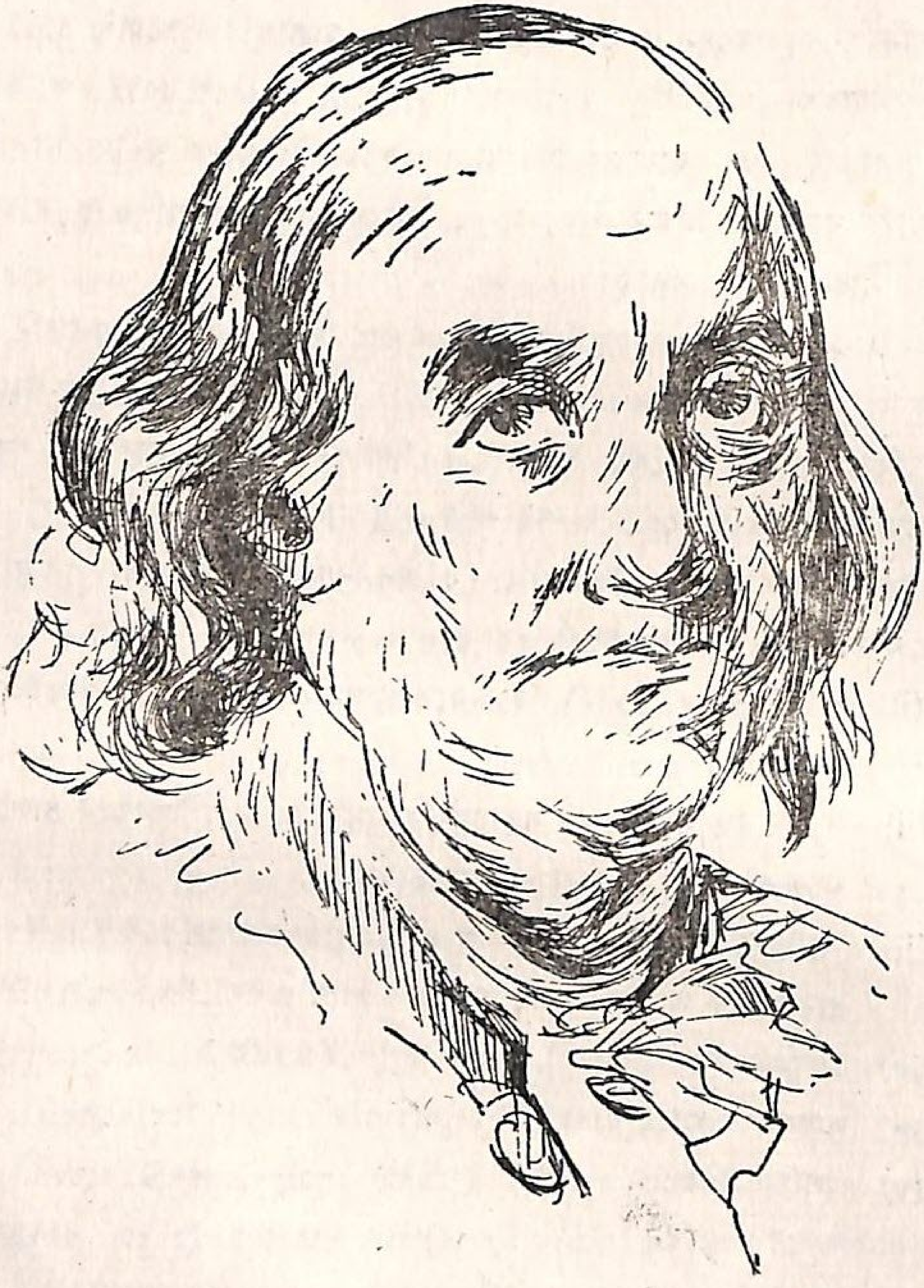
(iv) তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি অ্যালকোহলকে বিভিন্ন জৈব পদার্থের সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

(v) রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ইংরেজী analysis শব্দটি বয়েলই প্রথম ব্যবহার করেন। নির্দিষ্ট পরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে সনাক্তকরণের নীতি তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করেন।

(vi) অ্যাসিড ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য বয়েলেই প্রথম অনুধাবন করেন।

(vii) বয়েলই প্রথম বলেন যে, ব্যারোমিটার যন্ত্রকে পাহাড়ের উচ্চতা মাপার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চৌষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত রবার্ট বয়েল জীবিত ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি রসায়ন বিজ্ঞান, আলোক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এমন কি ধর্ম বিষয়েও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 1691 সালে ইংলণ্ডের এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।



বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন
(1706—1790)

পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কমই জন্মেছেন যিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, কুটনীতিক, মুদ্রাকর ও লেখক। হ্যাঁ, এমনই এক বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন 'বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন'।

1706 সালের 17-ই জানুয়ারী আমেরিকার বোস্টন শহরে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল 'জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন' ও মায়ের নাম ছিল 'আবিয়া'। আবিয়া ছিলেন জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিনের

দ্বিতীয়া স্ত্রী। ফ্রাঙ্কলিন পরিবারের সতেরটি সন্তানের মধ্যে বেঞ্জামিন ছিলেন পঞ্চদশ সন্তান।

পিতা জোসিয়া ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি চর্বি দিয়ে মোমবাতি বানিয়ে বিক্রী করতেন। সাবানের ব্যবসাও করতেন। মস্ত বড় পরিবারে প্রচুর খরচ হতো। আথিক স্বাচ্ছল্য ছিল না বলে জোসিয়া তাঁর দশ বছরের ছেলেকে আপন কাজে সাহায্য করার জন্যে দোকানে নিয়ে যান। কিন্তু দোকানে মন বসলো না ছেলেটির। বৈমাত্রেয় ভাই জেমস্-এর একটি মুদ্রণ কারখানা ছিল। জেমস্ তখন সেই কারখানায় বেঞ্জামিনকে নিয়ে গেলেন শিক্ষানবীশরূপে। নানা রকম বই ছাপা হতো সেই মুদ্রণশালায়। বালক বেঞ্জামিন ছাপাখানার কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে রকমারি বই পড়ে আয়ত্ত করতে লাগলেন। তাঁর পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল অঙ্ক আর জ্যামিতি।

বড় ভাই জেমস 1721 সালে 'দি নিউ ইংল্যাণ্ড কুরাণ্ট' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। বেঞ্জামিন সেই পত্রিকায় 'মিসেস সাইলেন্স ডগউড' ছদ্মনামে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতে লাগলেন। ঐ বয়স থেকেই তাঁর রচনা ছিল ক্ষুরধার, কৌতুক রসে সমৃদ্ধ অথচ বিজ্ঞ মন্তব্যপূর্ণ। বেঞ্জামিন প্রত্যহ রাতের অন্ধকারে ছাপাখানার অপিসঘরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে গোপনে রচনা ফেলে দিয়ে আসতেন। সেই রচনা প্রকাশিত হতো তার উৎকর্ষতার জন্যে। কিন্তু রচনাগুলির রচয়িতা যে কে, তা কেউ জানতে পারতো না। ঐ সব রচনার প্রকৃত লেখক যে কে, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না।

1722 সালে একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে জেমস কারারুদ্ধ হন। তখন বেঞ্জামিনের বয়েস ষোল বছর মাত্র। ঐ বয়সেই বেঞ্জামিন যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু এক বছর বাদে, অর্থাৎ 1723 সালে 'দি নিউ ইংল্যাণ্ড ক্যুরাণ্ট' এক সরকারী আদেশ বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেঞ্জামিন সামান্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে বোস্টন ছেড়ে সমুদ্রপথে রওনা হন নিউইয়র্ক অভিমুখে। নিউইয়র্কে পৌছে চাকরি যোগাড় করতে পারলেন না বেঞ্জামিন। তাই 1723 সালের অক্টোবর মাসে তিনি চলে গেলেন ফিলাডেলফিয়ায়। সেখানে এক ছাপাখানায় চাকরি জুটে গেল। জুটে গেল বেশ কিছু বন্ধুও।

1728 সালে ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়ায় নিজস্ব মালিকানায় একটি

ছাপাখানা স্থাপন করলেন। তাছাড়া 'পেনসিলভ্যানিয়া গেজেট' নামে একটি চালু সংবাদপত্র কিনে নিজেই তা চালাতে লাগলেন। ঐ পত্রিকায় থাকতো সংবাদ, বিজ্ঞাপন এবং উপরি হিসাবে বেঞ্জামিনের সরস রচনা। পত্রিকাটি আমেরিকায় সেকালে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

1730 সাল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিয়ে করলেন। বিয়ে করলেন ডেবোরা রীডকে। এই সময় বেঞ্জামিন একখানি অভিনব পঞ্জিকা প্রকাশ শুরু করেন। তার নাম দেন 'পুওর রিচার্ডস অ্যালম্যানাক'। সাধারণ পঞ্জিকায় যে সব তথ্য থাকে, এই পঞ্জিকায় তা তো থাকতই। উপরন্তু থাকতো রিচার্ড স্যাণ্ডার্স-এর ছড়া। মেয়েদের আলস্য নিয়ে ভারী মজার মজার ছড়া। আরও মজার কথা এই যে 'রিচার্ড স্যাণ্ডার্স' একটি কাল্পনিক নাম। ঐ নামে বেঞ্জামিন নিজেই ছড়াগুলি লিখতেন। আবার রিচার্ডের স্ত্রীর জবানীতে বেঞ্জামিন পুরুষদের অপদার্থতা বর্ণনা করে রিচার্ডের ছড়ার প্রত্যুত্তর দিতেন।—এ যেন কবির লড়াইয়ের মতো ছড়ার লড়াই! এই অতিরিক্ত আকর্ষণটির জন্যে 'পুওর রিচার্ডস অ্যালমানাক' তখন দারুণ বিক্রী হতো।

1727 সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটি পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দেন 'দি জাণ্টো'। প্রতি হপ্তায় এই পাঠচক্রের সদস্যরা মিলিত হয়ে বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এর চার বছর বাদে জাণ্টোর সদস্যদের দানের টাকায় তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রন্থাগারের নাম রাখা হয় 'লাইব্রেরী কোম্পানী অফ্ ফিলাডেলফিয়া'। এটি আমেরিকার প্রথম 'সার্কুলেটিং লাইব্রেরী'।

সাতাশ বছর বয়স থেকে ফ্রাঙ্কলিন বিদেশী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। একে একে তিনি ফরাসী, ইতালীয়, স্প্যানিশ, জার্মান, ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করতে থাকেন। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন খুঁজে বেড়াতো সত্যকে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি গভীর-ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এক বিশেষ ধরনের উন্মুক্ত চুল্লী তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। সাধারণ চুল্লীর তুলনায় সেই চুল্লী থেকে অনেক বেশী পরিমাণে তাপ পাওয়া যেতো। তিনি ঐ চুল্লীর নাম রেখেছিলেন 'পেনসিলভ্যানিয়া ফায়ার প্লেস'।

খুব উঁচু দরের কারিগর ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। তিনটি বড় চাকা সংলগ্ন দুটি ছোট চাকা দিয়ে তিনি এক অভিনব ঘড়ি তৈরি করেছিলেন। ঘণ্টা, মিনিট, এমনকি সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় নিখুঁতভাবে জানা যেতো ঐ ঘড়ি থেকে। নিজের

ব্যবহারের জন্যে তিনিই প্রথম বাইফোক্যাল চশমা তৈরি করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন 'হারমোনিকো' নামে এক অভিনব বাদ্যযন্ত্র।

তড়িৎ বিজ্ঞানে যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের। ঐ বিষয়ের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ 'এক্সপেরিমেন্টস্ অ্যাণ্ড অবজারভেশনস্ অফ্ ইলেকট্রিসিটি' সেকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্যে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র আছে। নাম তার 'লিডেন জার'। লিডেন জার নিয়ে ফ্রাঙ্কলিনের গবেষণা বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়েই ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ শক্তির অবিনশ্বরতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুৎ আহরণের যে অভিনব পরীক্ষাটি তিনি করেছিলেন, তার একটা বিবরণ আমরা পাই 1751 সালে প্রকাশিত 'ফিলাডেলফিয়া গেজেট' পত্রিকা থেকে। ঐ গেজেটে প্রকাশিত বিবরণটি এই রকম:

"ঐ বছর জুন মাসের এক ঝড়বৃষ্টির দিনে ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়া শহরের উপকণ্ঠে সিল্কের কাপড়ে তৈরি একটি ঘুড়ি নিয়ে আসেন। ঘুড়িটিকে যখন ওড়ানো হয়, তখন আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ফ্রাঙ্কলিন একটা গাছের নীচে চালা ঘরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে ঐ ঘুড়িটির দিকে লক্ষ্য রাখেন। দেখা যায়—ঘুড়িটি ক্রমাগত আকাশে উপরে উঠছে, ও তার চারপাশে মেঘের দল জটলা করছে। ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা সুতার যে প্রান্ত তাঁর হাতের কাছে ছিল, সেই প্রান্তে বাঁধা ছিল একটি ধাতব চাবি। যেই না একখণ্ড মেঘ ঘুড়িটিকে অতিক্রম করলো অমনি ধাতব চাবিটি তড়িৎ প্রভাবান্বিত হলো। চাবিটি স্পর্শ করা মাত্রই ফ্রাঙ্কলিন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্ অনুভব করলেন। একবার নয়, একাধিকবার এই পরীক্ষাটি সাফল্যের সঙ্গে করে ফ্রাঙ্কলিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আকাশের বিদ্যুৎ ও যন্ত্র থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ একই প্রকৃতির। এই দুই তড়িৎ-এর ধর্মও একই রকম।"

ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে। তার ফলে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান পান। তিনি প্রমাণ করেন যে কালো রং তাপ শক্তিকে শোষণ করে কিন্তু সাদা রং তাপ শক্তিকে প্রতিফলিত করে দেয়। আবার সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালাকে নিমেষে শান্ত করা যায় সাগরে একটু তেল ফেলে দিলে। জমিতে 'জিপসাম' নামক খনিজ পদার্থ প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতা বাড়ে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা ফ্রাঙ্কলিন এইসব সত্যকে

উদ্ঘাটিত করেন। সুউচ্চ অট্টালিকাকে বজ্রাঘাতজনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন 'বজ্রবাহী দণ্ড'। অট্টালিকার চূড়ায় তিনি তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত একটি ধাতব দণ্ড লাগিয়ে তার সঙ্গে সংযুক্ত লম্বা একটি অন্তরিত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের শেষ প্রান্ত পুঁতে দেন মাটির মধ্যে। যখন সেই অট্টালিকার উপরে বজ্রবাহী মেঘের সঞ্চার হয় তখন বজ্রবাহী দণ্ড মেঘের তড়িতাধানকে আকর্ষণ করে। ঐ তড়িতাধান তখন পরিবাহী তার বেয়ে চলে যায় মাটির মধ্যে। ফলে অট্টালিকা রক্ষা পায় বজ্রপাতজনিত ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে।

আজ আমরা ধনাত্মক আধান, ঋণাত্মক আধান প্রভৃতি নামগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই এই দুই রকম আধানের প্রকৃতি নিরূপণ করেন, নামকরণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে তড়িৎকোষের তড়িৎ আধান ধ্বনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুর দিকে অগ্রসর হয়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন খুব পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কালক্রমে পরিণত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে—পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শনশাস্ত্র নিয়েও অনেক পড়াশুনা করতেন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার 'ফিলজফিক্যাল সোসাইটি'।

1970 সালের 17-ই এপ্রিল চুরাশী বছর বয়সে অসামান্য প্রতিভাধর এই মানুষটি দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় দু'শো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে কিন্তু তাঁর কর্মময় মহান জীবনের আদর্শ শুধু আমেরিকাবাসী নয়, জগদ্বাসীর হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে আছে।



বিজ্ঞানী ঃ ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেল
(1738—1822)

আদি নাম ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম হার্শেল। জন্ম—জার্মানীর অন্তর্গত হ্যানোভার শহরে। পিতা আইজ্যাক হার্শেল হ্যানোভার শহরের এক বিখ্যাত কনসার্ট পার্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। আজীবন তিনি সুর সাধনাই করে গেছেন।

পিতা মাতার অনেক গুণই পুত্রে বর্তায়। পুত্র ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনা

বাল্যকালেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। হ্যানোভারেই তিনি যন্ত্র-সঙ্গীতের তালিম নেওয়া শুরু করেছিলেন। বাল্যের গণ্ডী পেরিয়ে উইলিয়াম হার্শেল যখন কৈশোরে পদার্পণ করলেন, তখন ঘটে গেল এক নিদারুণ পারিবারিক বিপর্যয়। পিতা আইজ্যাক হার্শেল মারা গেলেন। সংসারের দায়-দায়িত্ব বর্তালো কিশোর ছেলেটির উপর।

1757 সালে হার্শেল চলে এলেন ইংলণ্ডে। জীবিকার্জনের তাগিদে যোগ দিলেন কনসার্ট পার্টিতে। এতদিন যা ছিল সাধনা ও অবসর বিনোদনের সুন্দর উপায়, এখন তা পরিণত হলো জীবিকার্জনের হাতিয়ারে। সে যাই হোক, ঐ বয়সেই তাঁর বাজনা শুনে সমঝদার সঙ্গীতজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেনঃ বড় হলে ছেলেটি খুব উঁচু দরের যন্ত্র-সঙ্গীত শিল্পী হবে।—ওঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল। যৌবনকালে ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেল নিজেকে একজন খ্যাতনামা যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কনসার্ট পার্টির অধিকর্তার পদও অলংকৃত করেছিলেন। যৌবন কালেই তিনি তাঁর স্বর সাধনার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

একটা কথা বলা হয় নি।

সঙ্গীতজ্ঞরূপে কাজ করলেও অবসর সময়ে হার্শেল গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতেন। ফারগুসন-এর 'অ্যাস্ট্রনমি' বইখানি পড়ে হঠাৎ একদিন হার্শেলের বাসনা হলো সৌরমণ্ডলকে চাক্ষুষ দেখার। কিন্তু খালি চোখে তো ভালভাবে দেখা সম্ভব নয়। ভালভাবে দেখতে হলে দরকার দূরবীন যন্ত্রের। সে যন্ত্রের দাম তখন অনেক। অতো দাম দিয়ে দূরবীন যন্ত্র কেনার সঙ্গতি ছিল না তাঁর। তিনি তাই নিজেই দূরবীন তৈরি করার কাজে হাত দিলেন।

ছোটবোন 'ক্যারোলিন লুক্রেশিয়া হার্শেল' অল্প বয়স থেকেই দাদার সঙ্গীত সাধনার অংশীদার ছিলেন। নিজে সঙ্গীত চর্চা করতেন। দাদাকেও উৎসাহ দিতেন। এখন দাদার মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করে ক্যারোলিন বেশ অবাক হলেন। অবাক হবারই তো কথা। যন্ত্র সঙ্গীতে দাদার দারুণ সুনাম, রোজগারও নেহাৎ কম নয়। এমন সময় হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ আয়োজন ক্যারোলিনের কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকলো। তবুও দাদাকে মুখে তিনি কিছু বললেন না। বরাবরের মত এবারও দাদাকে তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর কাজে সহযোগিতাও করতে লাগলেন।

অবশেষে উইলিয়াম হার্শেল তাঁর নতুন প্রচেষ্টায় সফল হলেন। প্রথমে

তৈরি করলেন দু' ইঞ্চি ব্যাসের একটি সাধারণ দূরবীন। তাই দিয়েই শুরু করলেন আকাশ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু তাতে সুবিধা না হওয়ায় পরে ছ' ফিট ফোকাস দূরত্বের একটা বড় দূরবীন তৈরি করে ফেললেন। ঐ দূরবীনের সাহায্যে 1781 সালে তিনি 'ইউরেনাস' নামক একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন। সুরসাধক উইলিয়াম হার্শেল জ্যোতির্বিজ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। তাঁর আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে।

পরের বছর অর্থাৎ 1782 খ্রীস্টাব্দে হার্শেল রাজা তৃতীয় জর্জের 'রাজ জ্যোতিষী' নিযুক্ত হলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। তখনকার দিন পর্যন্ত শনিগ্রহের মাত্র পাঁচটি উপগ্রহের কথা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। হার্শেল শনির আরও দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করলেন। গ্রহ ও উপগ্রহদের ঘূর্ণন নিয়েও গবেষণা করতে লাগলেন। এরপর তিনি চার ফিট ব্যাস এবং চল্লিশ ফিট ফোকাস দূরত্বের একটি বড় দূরবীন তৈরি করে আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজ চালাতে লাগলেন। সন্ধান পেলেন বহু যুগ্ম তারা ও নীহারিকার। তাঁর দূরবীনেই প্রথম ধরা পড়লো ছায়াপথের প্রকৃত পরিচয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে বহু দূরের অসংখ্য তারা নিয়ে গঠিত হয় 'ছায়াপথ'। এটা লক্ষ্য করার পরই তিনি অনুমান করেন যে, নীহারিকা-গুলি বহুদূরে অবস্থিত কতকগুলি নক্ষত্র জগৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। দীর্ঘকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে উইলিয়াম হার্শেল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমগ্র সৌরজগৎ মহাকাশের একদিকে ছুটছে। যে বিন্দুর দিকে ছুটছে, হার্শেল তার অবস্থানেরও নির্দেশ দেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে উইলিয়াম হার্শেল রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। জ্যোতি-বিজ্ঞানে হার্শেলের অবদানের কথা বলতে গেলে আপনা-আপনিই তাঁর ছোট বোন ক্যারোলিনের কথাও এসে পড়ে। কি সঙ্গীত সাধনায়, কি জ্যোতি-র্বিজ্ঞান চর্চায়—সর্বক্ষেত্রেই উইলিয়াম হার্শেলের কৃতিত্বের মূলে আছে এই নারীর অনন্যসাধারণ সহযোগিতা। ভাই এর সঙ্গে কাজ করতে করতে ক্যারোলিনও হয়ে ওঠেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি আটটি ধূমকেতু ও তিনটি নীহারিকা আবিষ্কার করে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

প্রখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেল পরিণত বয়সে 1822 খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল গেছে কেটে কিন্তু তাঁর নাম জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।



আমেদিও অ্যাভোগাড্রো
(1776—1856)

1811 সাল।

ফরাসী দেশের বিজ্ঞান পত্রিকা 'জার্নাল ডি ফিজিক' (Journal de Physique) এর একটি সংখ্যার জ্ঞানীগুণী গ্রাহকবর্গ পত্রিকাখানি হাতে পেয়ে আগ্রহ সহকারে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন, কি কি আছে ঐ সংখ্যায়।— প্রথমেই দেখা গেল, ছোটখাটো দুটি অবিষ্কারের বিবরণ। পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে ছিল কয়েকজন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিবরণ। পিছনের দিকের কয়েকটি পাতায় ছিল অণু ও পরমাণুর পার্থক্য বিষয়ক একটি রচনা। রচনাটি মোটামুটি কৌতূহল উদ্রেক করে। এটির রচয়িতা, এক ইটালীয়

অধ্যাপক। সব শেষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। ব্যস, আর কিছু ছিল না পত্রিকার ঐ সংখ্যাটিতে।—এক কথায় মোটেই আহামরী পত্রিকা নয়। গ্রাহকবর্গ নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী হয়তো সেটিকে পড়ে অযত্নে ফেলে রাখলেন। তারপর পত্রিকাটির উপর জমলো ধুলো। ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে লাগলো তার পৃষ্ঠাগুলি।

কিন্তু না, তা হলো না। পরবর্তীকালে পত্রিকাটির শতবর্ষ পূর্তির দিনে ঐ সংখ্যাটিই বিশেষ মর্যাদা পেলো, রাতারাতি হয়ে উঠলো অতি বিখ্যাত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ছুটে এলেন ইটালী দেশে—ঐ পত্রিকাটির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেই দিনটিতে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন ইটালীয় অধ্যাপক আমেদিও অ্যাভোগাড্রোর উদ্দেশ্যে, কারণ ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অণু ও পরমাণু বিষয়ক তাঁর রচনাটি ইতিমধ্যেই পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি মূল্যবান দলিলরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

কিন্তু কে এই অ্যাভোগাড্রো ?

বলছি সে কথা।

প্রথমেই বলি ওঁর পিতৃপরিচয়ের কথা।

ওঁর পিতা ইটালীর টুরিন নামক স্থানে ওকালতি করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, ছেলেও বড় হয়ে তাঁর মতো আইন ব্যবসায়ী হবে। এক সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।—পিতার ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন আমেদিও অ্যাভোগাড্রো, তবে একটু অন্য ভাবে। প্রথমে আইন ব্যবসায়ী রূপে আত্ম-প্রকাশ করলেও পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী রূপে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মাত্র ষোল বছর বয়সে অ্যাভোগাড্রো স্নাতক হন। কুড়ি বছর বয়সে চার্চ-আইনে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে আইনজ্ঞরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, বিত্তশালী বণিক ও সমাজ-পতিদের সংস্পর্শে আসতে থাকেন। এতে অ্যাভোগাড্রোর জীবনে আসে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ; বৃদ্ধি পায় তাঁর সামাজিক মর্যাদা।

অ্যাভোগাড্রো কিন্তু নিজেকে আইন চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না। রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র পড়তে খুব ভালবাসতেন তিনি। প্রতিভা ছিল বলে স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞানের এই তিন শাখার মূল নীতিগুলিকে সুন্দরভাবে আয়ত্ত করে ফেলেন। এক চার্চ আইনজ্ঞ আবির্ভূত

হন বিজ্ঞানীরূপে।

তখন থেকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে তিনি মগ্ন হয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। অ্যাভোগাড্রোর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও গবেষণার বিষয়গুলি তাঁরা গভীর আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করতে থাকেন। শীঘ্রই উত্তর ইটালীর একটি ছোট কলেজে অ্যাভোগাড্রো পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণাকালেই তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অনুবাদ' ও 'অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প' প্রণয়ন করেন এবং 1811 সালে বিজ্ঞান পত্রিকা 'জার্নাল ডি ফিজিক' এ তা প্রকাশিত হয়।

এখানে অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সূচনা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ডালটনের পরমাণুবাদ অনুসারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি সরল সংখ্যার অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগের ক্ষুদ্রতম অংশ, অর্থাৎ যৌগিক পরমাণু উৎপন্ন করে। বলা বাহুল্য, ডালটনের পরমাণুবাদে অণুর কল্পনা করা হয় নি।

এই সময়, গেলুসাক তাঁর গ্যাসায়তন সূত্রে বলেন ; একই চাপ ও উষ্ণতায় গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়ার সময় গ্যাসগুলির আয়তন সরল অণুপাতে থাকে। বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলি যদি গ্যাসীয় হয় তবে, উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন বিক্রিয়াকারী গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে সরল অণুপাতে থাকে।

এই দুটি তথ্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, গ্যাসগুলির আয়তন ও পরমাণুর সংখ্যার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি গে লুসাকের গ্যাসায়তন সূত্র ও ডালটনের পরমাণুবাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেন। সেই প্রকল্পটি হচ্ছে : "একই চাপ ও উষ্ণতায় সম আয়তন সকল গ্যাসের মধ্যে সম সংখ্যক পরমাণু বর্তমান থাকে।"

কিন্তু বাস্তব পরীক্ষায় দেখা যায় যে, একই উষ্ণতায় ও চাপে 1 আয়তন হইড্রোজেন এবং 1 আয়তন ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় 2 আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

বার্জেলিয়াসের মত অনুসারে মনে করা যাক, এক আয়তন হাইড্রোজেনের মধ্যে n সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। তাহলে এক আয়তন ক্লোরিনের মধ্যে n সংখ্যক ক্লোরিন পরমাণু এবং দুই আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের

মধ্যে 2n সংখ্যক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরমাণু থাকবে।

তার মানে, n সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু + n সংখ্যক ক্লোরিন পরমাণু = 2n সংখ্যক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরমাণু। অথবা একটি হাইড্রোজেন পরমাণু + একটি ক্লোরিন পরমাণু = তুটি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরমাণু।

অথবা $\frac{1}{2}$ হাইড্রোজেন পরমাণু + $\frac{1}{2}$ ক্লোরিন পরমাণু = 1টি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরমাণু। তার মানে, 1টি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরমাণুর মধ্যে আধখানি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং আধখানি ক্লোরিন পরমাণু বর্তমান।

তাহলে বার্জেলিয়াসের মত অনুসারে পরমাণুকে বিভাজ্য হতে হয়, অর্থাৎ পরমাণু ভগ্নাংশ হতে পারে। কিন্তু ডালটনের পরমাণুবাদ বলে যে পরমাণু অবিভাজ্য। তা কখনও ভগ্নাংশ হতে পারে না। কাজেই বার্জেলিয়াসের প্রকল্প, গে লুসাকের গ্যাসায়তন সূত্র ও ডালটনের পরমাণুবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলো না।

এই অসুবিধা দূর করলেন ইটালীয় বিজ্ঞানী আমেদিও অ্যাভোগাড্রো। তিনিই সর্বপ্রথম মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এবং গ্যাসের ক্ষুদ্রতম কণার মধ্যে পার্থক্য কল্পনা ক'রে অনুবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা তু'রকম, (i) পরমাণু ও (ii) অণু।

'পরমাণু' হলো মৌলিক পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম কণা, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পরমাণু স্বাধীনভাবে নাও থাকতে পারে। আর প্রকৃতিতে স্বাধীন অবস্থায় কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সবচেয়ে ছোট যে কণা পাওয়া যায়, তারই নাম 'অণু'। পরমাণুর সংযোগে গড়ে ওঠে অণু। তাছাড়া অণু আবার তু'রকম—মৌলিক অণু ও যৌগিক অণু। মৌলিক অণু তু'ভাবে গঠিত হ'তে পারে। কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আছে, যাদের অণু একটিমাত্র পরমাণু দিয়ে গড়া। এ সব ক্ষেত্রে অণু ও পরমাণুর অর্থ একই। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, কার্বন, বোরন ইত্যাদি মৌলের অণুগুলি একটি করে পরমাণু দিয়ে গড়া। কিন্তু হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় মৌলের অণু তু'টি করে পরমাণু দিয়ে গড়া।

অ্যাভোগাড্রো বললেন, যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন কণা বা অণু একাধিক মৌলিক পদার্থের এক বা তার বেশী সংখ্যক পরমাণু দিয়ে গড়া।—এই রকম অণুকেই অ্যাভোগাড্রো 'যৌগিক অণু' আখ্যা দেন। জলের অণু নাইট্রিক অ্যাসিডের অণু, অ্যামোনিয়ার অণু—যৌগিক অণুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এইভাবে অণুর সঠিক কল্পনা করার পর অর্থাৎ অনুবাদ রচনা করার পর

অ্যাভোগাড্রো বলেন ঃ "একই উষ্ণতা ও চাপে সম আয়তন যে কোন্ গ্যাসের মধ্যে সমান সংখ্যক অণু থাকে।"—এইটাই 'অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প' নামে খ্যাত। এই প্রকল্পের সাহায্যে গে লুসাকের গ্যাসায়তন সূত্র ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো ; সম্ভব হলো ডালটনের পরমাণুবাদের সংশোধন।

অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প হতে 'অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা' ও নির্ণীত হয়েছে। "যে কোন পদার্থের এক গ্রাম অণুতে সমান সংখ্যক অণু বর্তমান থাকে। এই সংখ্যাকে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা বলে।" অ্যাভোগাড্রো সংখ্যাকে N অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা $N=6.023 \times 10^{23}$; বিজ্ঞানী মিলিকান এই সংখ্যাটি নির্ণয় করেন।

অ্যাভোগাড্রো অণুর সংখ্যা গণনা করতে পারেন নি বলে তাঁর প্রকল্পের সত্যতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হন নি। এ কালের বিজ্ঞানীরা স্ফটিকের এক্স-রশ্মি ডিফ্র্যাকশনের সাহায্যে তাঁর প্রকল্পের সত্যতা যাচাই করে নিতে পেরেছেন।

ইটালীয় রসায়নবিদ ক্যানিজারো অ্যাভোগাড্রোর অনুবাদ ও অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে। এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্যে রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে কোপ্‌লে পদক প্রদান করে সম্মানিত করেন। 1811 সালে প্রকাশিত 'জার্নাল ডি ফিজিক' পত্রিকার সেই বিশেষ সংখ্যাটি জার্মানীর যাদুঘরে আজও সুরক্ষিত আছে এবং সেটি একটি বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক দলিলরূপে মর্যাদা পাচ্ছে।



কার্ল ফ্রেডরিক গাউস
(1777—1855)

1787 সাল।

জার্মানীর একটি স্কুল।

স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে অঙ্কের মাস্টারমশাই কোনও এক সময় পড়াতে এলেন। সেদিন মাস্টারমশাই-এর কি খেয়াল হলো কে জানে! ছাত্রদের কিছুক্ষণ কাজে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে মাস্টারমশাই বললেনঃ "ছেলেরা শোন! এক থেকে একশো পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাগুলির যোগফল কতো হয় তা আঁক ক'ষে বের কর দিকি"—এই বলে মাস্টারমশাই চোখে চশমাটা লাগিয়ে একখানি বই খুললেন। কিন্তু তাঁর বই পড়ায় বাদ সাধলো দশ বছর বয়সী একটি ছেলে, নাম 'কার্ল ফ্রেডরিক গাউস'। মিনিট খানেকের মধ্যেই ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সঠিক উত্তরটি বলে দিল।

মাস্টারমশাই ভাবলেন, ছেলেটির বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তরটা জানা ছিল। হয়তো বা গৃহ-শিক্ষক কিংবা অভিভাবকদের কাছ থেকে এ প্রশ্নটি শুনে তার উত্তরটি মুখস্ত করে রেখেছিল। ছেলেটি কিন্তু নিজেই মাস্টারমশাই-এর এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটালো। সে বললো ঃ "স্যার, বীজগণিতের সাহায্য নিয়ে আমি এই অঙ্কটির সঠিক সমাধান বের করে ফেলেছি।"

'তাই নাকি ? দেখি দেখি তোমার খাতাখানা।'

—ছেলেটি তার খাতা তুলে দিলো মাস্টারমশাই-এর হাতে। অবাক বিস্ময়ে মাস্টারমশাই দেখলেন যে 'কার্ল' তার খাতায় লিখেছে $S=\frac{n}{2}(n+1)$, যেখানে 'n' যে কোনও একটি পূর্ণ সংখ্যা। তারপর এই ফর্মুলায় 'n' এর মান 100 বসিয়ে সমীকরণটি সমাধান করে সে 'S' এর মান পেয়েছে 5050। —হ্যাঁ, এইটাই সঠিক উত্তর এবং এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই উত্তরটি সে বের করে ফেলেছে ! কার্ল-এর গাণিতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে সেদিন অবাক হয়েছিলেন মাস্টারমশাই।

কার্ল এর জন্ম হয় 1777 সালের 30শে এপ্রিল তারিখে। তাঁর বাবা জার্মানীর ব্রুন্‌সউইক এর এক সামান্য ইট প্রস্তুতকারক ছিলেন। শৈশব কালেই এই বালকের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার স্ফূরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মাত্র চার বছর বয়সের ছেলে মানসাঙ্কে এমনই পটু ছিল যে তার বাবার জমা-খরচের হিসাবের খাতার ভুল ধরতো।

সাত বছরে পদার্পণ করার আগেই কার্ল ভর্তি হলো এক প্রাথমিক স্কুলে। বারো বছর বয়সে এই বালকই ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ভিত্তি নিয়ে সমালোচনা করতে সাহসী হয়েছিল। তেরো বছর বয়সে সে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সম্ভাব্যতা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল। পনের বছর বয়সে এই ছেলেটিই 'বাইনমিয়াল থিওরেম' প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কার্ল এর এই অনন্য সাধারণ গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ব্রুন্‌সউইক এর ডিউক কার্ল এর মাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ডিউকের এই প্রস্তাব কার্ল এর বাবার মনঃপূত হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন যে, ছেলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করবে এবং তাঁর সংসার খরচের ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জেদ বজায় রাখেন নি। বাধা দেন নি ছেলের উচ্চ শিক্ষার বাসনায়।

চৌদ্দ বছরের ছেলে কার্ল এর কাছে অঙ্ক শাস্ত্র ছিল এক দুর্নিবার আকর্ষণ। গটিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি স্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে

সতেরটি বাহুযুক্ত এক বহুভূজ ক্ষেত্র আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন। কার্ল এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি করেছিলেন 1796 সালের 30শে মার্চ তারিখে। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির বিগত 2200 বছরের ইতিহাসে কার্ল এর এই আবিষ্কারটি এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সূচনা করলো।

1798 সালে কার্ল গটিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে স্নাতক হন। তারপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন হেল্‌মস্টেড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শুধু বিশুদ্ধ গণিতই নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং ভূপরিমাপ বিজ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এ ভিন্ন তিনি ছিলেন বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক এবং বহু ভাষায় পারদর্শী। বহু ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারতেন। যাট বছর বয়সে তিনি রুশ ভাষা শিখে তাতেও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। 1807 সালে ডক্টর গাউস একাধারে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সেখানকার মানমন্দিরের কর্ণধারের পদে বৃত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গাউস গণিত বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'Disquisitiones arithmetical' প্রকাশ করেন। এই সময় Ceres এবং Pallas নামে সদ্য আবিষ্কৃত দুটি ছোটখাটো নক্ষত্রের গতিপথ তিনি নির্ণয় করেন। ভ্রান্তি তত্ত্ব বা Theory of errors খুব ভালভাবে আয়ত্ত করে গাউস 'সম্ভাব্যতার লেখ' (Curve of probability) আবিষ্কার করেন। এটি 'গাউসীয় লেখ' নামেও পরিচিত এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে আজও এটি ব্যবহৃত হয়।

1833 সালে গাউস একটি অভিনব বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রটি তিনি তাঁর বাড়ী ও মানমন্দিরের (দূরত্ব সওয়া এক মাইল) মধ্যে বার্তা আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করতেন। একটি অভিনব ম্যাগনেটোমিটার যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তির রচয়িতাও ছিলেন এই গাউস। 1840 সালে ডক্টর গাউস আলোক বিজ্ঞানের, বিশেষ করে লেন্সের উপর গবেষণা করে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সুনাম অর্জন করেন।

সারা জীবনে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন কার্ল ফ্রেডরিক গাউস; কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তার অধিকাংশই অপ্রকাশিত রয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা বা তত্ত্ব তাঁর মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিত্য নূতন ধারণা তাঁর মাথায় আসতো। পাছে ভুলে যান, সেজন্যে টুকরো টুকরো

কাগজে অথবা ডায়েরীতে তিনি তা লিখে রাখতেন। নতুন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করার পর তা প্রকাশে উদ্যোগী না হয়ে তিনি অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করতেন। সত্যিকারের জ্ঞান তপস্বী যাঁরা, তাঁরা এমনিই হয়ে থাকেন।

গাউসের সমসাময়িক এক গণিতজ্ঞ ছিলেন। নাম তাঁর 'কার্ল জ্যাকবি'। বেশ কয়েকবার জ্যাকবি তাঁর গাণিতিক আবিষ্কার সম্বন্ধে গাউসকে অবহিত করতে তাঁর বাড়ী যান। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, প্রতিবারই গাউস তাঁর ড্রয়ার খুলে নিজের খাতা বের করে জ্যাকবিকে দেখিয়ে দেন যে, অনেক আগেই তিনি ঐ সব তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছেন কিন্তু প্রকাশ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্পর্কে কেউ সমালোচনা করলে সেকালের বিজ্ঞানীরা তাঁকে পাগল আখ্যা দিতেন। গাউস সম্ভবত সেই ভয়েই অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রকাশ করতে সাহসী হন নি।

বিশ্ববিশ্রুত এই বিজ্ঞানী 77 বছর বয়সে জার্মানীর গটিন্‌জেন-এ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুকাল 23শে ফেব্রুয়ারী, 1855 সাল। মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি স্তম্ভে তাঁরই আবিষ্কৃত 17টি বাহুযুক্ত বহুভূজের জ্যামিতিক চিত্রটি খোদাই করা হয়। আজও সেটি সেখানে শোভা পাচ্ছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁর এক অনন্য সাধারণ কীর্তিকে।



ফ্রেডারিক ভোলার

(1800—1882)

রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে রাসায়নিক যৌগগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এক শ্রেণীকে জৈব এবং অপর শ্রেণীকে অজৈব যৌগ বলা হয়। যে লবণ আমরা খাই, রসায়ন বিজ্ঞানীর ভাষায় তা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। কাপড় কাচার জন্যে যে সোডা আমরা ব্যবহার করে থাকি, রসায়নের ভাষায় তা হলো সোডিয়াম কার্বনেট। নানারকম রাসায়নিক শিল্পে যে কস্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়, রসায়ন বিজ্ঞানীরা তাকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বলে থাকেন।—এতক্ষন যে সব যৌগের নাম করলাম সেগুলির উৎস হলো খনিজ পদার্থ। এগুলিকে তাই অজৈব যৌগ নামে অভিহিত করা হয়। একাধিক নির্জীব বা জড় পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগের ফলে অজৈব যৌগের উৎপত্তি হয়।

1828 খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত রসায়ন বিজ্ঞানীরা জানতেন যে জৈব উৎস থেকে পাওয়া যায় বলে গ্লুকোজ, মাখন, চিনি, বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ও এনজাইমগুলি জৈব যৌগ শ্রেণীভুক্ত। অ্যামিনো অ্যাসিড বলতে আমরা সেই সব অ্যাসিডকে বুঝি, যাদের মধ্যে একাধারে 'কার্বকসিল' কার্যকরীমূলক (COOH) এবং অ্যামিনো গ্রুপ (NH_2) বর্তমান। গ্লাইসিন একটি অ্যামিনো অ্যাসিড। তার সংকেত $H_2N, CH_2,$ COOH। 'এনজাইম' শব্দটির অর্থও জেনে রাখা দরকার। জীবন্ত কোষে উপস্থিত যে সব নিষ্প্রাণ, নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল জৈব যৌগ অনুঘটকরূপে সন্ধান ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাদেরই 'এনজাইম' বা উৎসেচক বলা হয়। যে কোন এনজাইম যে কোন পদার্থের বিয়োজন ঘটাতে পারে না। ঈস্টের ছত্রাক কোষ থেকে যে এনজাইম সৃষ্টি হয়, তা শর্করাকে অ্যালকোহলে পরিণত করে। মুখের লালাতে 'টায়ালিন' নামে যে এনজাইম সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে খাদ্যের শ্বেতসার রাসায়নিক ক্রিয়ায় শর্করায় পরিণত হয়। আবার পেপ্‌সিন নামক এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যকে হজম করায়।

যাই হোক, রসায়নবিদেরা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে অদূর ভবিষ্যতে অজৈব যৌগের মতো জৈব যৌগও একদিন পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

প্রাণির মূত্র থেকে 'ইউরিয়া' নামে একটি জৈব যৌগ প্রস্তুত করা যায়। 'ফ্রেডারিক ভোলার' নামে এক জার্মান রসায়ণশাস্ত্রবিদ একদিন আকস্মিকভাবে অজৈব যৌগ হতে জৈব যৌগ 'ইউরিয়া' সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হন। আর এই আকস্মিক আবিষ্কার রসায়ন বিজ্ঞানে এক নব দিগন্তের সূচনা করে। 1828 সালের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাহিনী শোনাবার আগে আবিষ্কর্তার প্রথম জীবনের কথা একটু আলোচনা করা যাক্। দেখা যাক্— ভোলার তাঁর জীবনটাকে সার্থকভাবে গড়ে তুলেছিলেন কি উপায়ে।

1800 খ্রীস্টাব্দের 31শে জুলাই তারিখে জার্মানীতে ফ্রেডারিক ভোলারের জন্ম হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ফ্রেডারিকের পিতার বেশ ভাল জ্ঞান ছিল। তাই বিজ্ঞানের প্রতি পুত্রের অনুরাগ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। বাল্যকালেই রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মেছিল ফ্রেডারিকের। সেই বয়সে ছেলেটির প্রধান সখ ছিল নানা রকম খনিজ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা এবং সেগুলির পরিচয় পিতার কাছ থেকে জেনে নেওয়া।

কুড়ি বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে ফ্রেডারিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান

অধ্যয়ন করতে ভর্তি হলেন মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেটা হলো 1820 সালের কথা। কিন্তু পরের বছরই ফ্রেডারিক মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে এলেন হেইডেলবার্গে এবং সেখান থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক হয়ে বেরুলেন।

ছাত্রাবস্থায় হেইডেলবার্গে ফ্রেডারিক কিছুকাল সেখানকার রসায়নাগারে কাজ করেছিলেন। কাজ করেছিলেন—বিখ্যাত রসায়নশাস্ত্রবিদ লিওপোল্ড মেলিন (Leopold Gmelin) এর তত্ত্বাবধানে। অধ্যাপক মেলিন ছিলেন পাকা জহুরী। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝে ফেলেছিলেন যে ফ্রেডারিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের চেয়ে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি বেশী অনুরাগী। তিনি তাই ফ্রেডারিককে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করার উপদেশ দেন। —সানন্দে সে উপদেশ গ্রহণ করেন ফ্রেডারিক। উচ্চতর রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে তিনি তখনই পড়াশুনা শুরু করেন। শুধু তাই নয়। সেই সঙ্গে বিখ্যাত সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের রসায়নাগারে গবেষণাও শুরু করেন। গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেডারিক বার্লিন ও ক্যাসেল-এর টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে শিক্ষকতাও করতে থাকেন। 1825 থেকে 1836 সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন ফ্রেডারিক। এই সময়ের মধ্যেই ফ্রেডারিক 1828 সালে যে অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটি করেছিলেন, তার ফলাফল প্রকাশ করে ফেলেন। এই আবিষ্কারটিই ভোলারের নামকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখে। সেই আবিষ্কারের কাহিনীই শোনাব এখন।

1828 সাল। ভোলার তাঁর গবেষণাগারে বসে কতকগুলি অজৈব যৌগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। গবেষণা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে তিনি সাদা রঙের একটি যৌগের কতকগুলি সূচাকৃতী কেলাস পেয়ে গেলেন। ভোলারের পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। তখনই মনে পড়ে গেলো তাঁর ছাত্রাবস্থার কথা। ছাত্রাবস্থায় কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রাণির মূত্র থেকে একবার 'ইউরিয়া' নামক জৈব যৌগ প্রস্তুত করেছিলেন। জমির সার হিসাবে ইউরিয়া আজ সর্বজনপরিচিত। যাই হোক্, ইউরিয়ার কেলাসের সঙ্গে তাঁর এই সদ্য আবিষ্কৃত কেলাসগুলির অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভোলারের মনে হলো—এই কেলাসগুলি ইউরিয়ার কেলাস নয় তো? পরক্ষণেই আবার মনে হলো—তাই বা কি করে হয়! ইউরিয়া তো জৈব যৌগ। অজৈব উৎস থেকে জৈব যৌগ পাওয়া যাবে কি করে? তবুও ভোলারের সন্দিগ্ধ মন শান্ত হলো না। তিনি তখনই সাদা রঙের সূচাকৃতী ঐ কেলাসগুলির ধর্ম নিরূপণে ব্রতী হলেন এবং অচিরেই নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে,

ঐ সাদা কেলাসগুলি ইউরিয়ার কেলাসই বটে। তাঁর অনুমানই সত্যি।—তখনই আনন্দে ও উত্তেজনায় শিহরিত হয়ে উঠলেন ভোলার। অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামক অজৈব যৌগ থেকে আকস্মিকভাবে সংশ্লেষণ করে ফেলেছেন জৈব যৌগ 'ইউরিয়া'। রসায়নের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে ফেলেছেন তিনি। এ যাবৎ যে তত্ত্ব রসায়নবিদেরা সত্যি বলে বিশ্বাস করে এসেছেন, তার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন!

ভোলারের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের পর একে একে নতুন সব জৈব যৌগ রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হতে লাগলো। সংশ্লেষিত হলো কৃত্রিম নীল রং, বহুমূত্র রোগের ওষুধ—ইনসুলিন, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন,হর্মোন বা উত্তেজক রস ও হরেক রকম অ্যান্টিবায়োটিক। এমনিভাবে আজ পর্যন্ত শত সহস্র জৈব যৌগ রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয়েছে। এই সব সংশ্লেষিত জৈব যৌগ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষকে বিভিন্ন রোগের কবল থেকে মুক্ত করছে, সবুজ বিপ্লব ঘটাচ্ছে দেশ-বিদেশে।

ভোলারের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটির পরিচয় তো দেওয়া হলো। এবার তাঁর অন্যান্য কয়েকটি আবিষ্কারের কথা বলে ইতি টানব এই প্রবন্ধের। অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির বলে বলীয়ান হওয়ায় ভোলারের কর্মজীবনে সাফল্য এসেছে বার বার। তিনি ক্যালসিয়াম কার্বাইড যৌগটি এবং তার সঙ্গে জলের বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যাসিটিলিন গ্যাস আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এ ভিন্ন আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটেনিয়াম ধাতু আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁরই। শিল্প ও বিজ্ঞানে এইসব আবিষ্কারের গুরুত্বও কম নয়।

জার্মানীর এই কৃতী রসায়ন-বিজ্ঞানী 1882 সালের 23শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। সর্বদেশের, সর্বকালের সেরা রসায়ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভোলার অন্যতম। তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।



টমাস গ্রাহাম

(1805—1869)

রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে 'টমাস গ্রাহাম' একটি অতি পরিচিত নাম। রসায়নের ছাত্রদের পড়তে হয় 'গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র'। কিন্তু কে এই গ্রাহাম?—ইনি ছিলেন স্কটল্যাণ্ড নিবাসী এক বিখ্যাত ভৌত রসায়নবিদ।

1805 সালে গ্লাসগোতে টমাস গ্রাহামের জন্ম হয়। 1824 সালে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গ্রাহাম এডিনবার্গে জে. সি. হোপ এর ল্যাবরেটরীতে দু'বছর গবেষণা করেন। এরপর তিনি স্বদেশে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং কিছু ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় ক'রে

তাদের রসায়ন বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা দিতে থাকেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম শীঘ্রই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমে মেকানিক্স ইনস্টিট্যুট ও পরে অ্যাণ্ডারসোনিয়ান ইনস্টিট্যুশনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। 1937 সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়ে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যাপনা শুরু করেন।

গ্রাহাম 'এলিমেণ্টস অফ কেমিস্ট্রি' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। বইখানি 1841 সালে প্রকাশিত হয় এবং সেই সময় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে মন্তব্য করেন "এ পর্যন্ত রসায়ন বিজ্ঞানের উপর লেখা যাবতীয় বইয়ের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ"। বইখানি প্রকাশিত হবার পর এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে সেটি জার্মান ভাষায় অনুদিত হয় এবং রসায়ন বিজ্ঞান পড়ুয়াদের প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিসাবে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

1829 সালে গ্রাহাম গ্যাসের ব্যাপন ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে "গ্রাহামের গ্যাস-ব্যাপন সূত্র" রচনা করেন। এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে 'গ্যাসের ব্যাপন' বলতে কি বোঝায় তা জেনে রাখা দরকার।—দেখা গেছে যে; সমস্ত গ্যাসই পরস্পর মেশালে গ্যাসগুলি সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে সমসত্ত্ব মিশ্রণে পরিণত হয়, অবশ্য যদি গ্যাসগুলির মধ্যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া না হয়। ক্লোরিন গ্যাস বায়ুর চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ ভারী। একটি ঘরের মধ্যে ক্লোরিনপূর্ণ পাত্র খুলে দিলে দেখা যায় যে সমস্ত ঘরের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের প্রত্যেক অংশের বায়ু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সব জায়গায় বায়ু ও ক্লোরিনের অনুপাত সমান।

আবার অক্সিজেন গ্যাস হাইড্রোজেনের চেয়ে প্রায় ষোলগুণ ভারী। এখন অক্সিজেনপূর্ণ একটি গ্যাসজারের উপরে হাইড্রোজেনপূর্ণ অন্য একটি গ্যাসজার উপুড় করে দিলে, কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে গ্যাস দুটি পরস্পর মিশে সমসত্ত্ব মিশ্রণ সৃষ্টি করেছে। হাইড্রোজেন খুব হাল্কা গ্যাস হলেও অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাস-জারের মধ্যে নেমে আসে, আর অক্সিজেন গ্যাস ভারী হলেও অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে উপরের গ্যাসজারটির মধ্যে উঠে যায়। অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে একটি পদার্থের, অন্য একটি পদার্থের ভিতরে স্বাভাবিক ও স্বতঃ অনুপ্রবেশকে 'ব্যাপন' বলে। তার মানে, দুটি অসমান ঘনত্বের গ্যাসের পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণের পদ্ধতিকেই বলা হয় গ্যাসের ব্যাপন প্রণালী।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন পাত্রের মধ্যে কোন গ্যাসকে আবদ্ধ ক'রে

রাখলে গ্যাসের অনুগুলি পাত্রের দেওয়ালের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বের হ'য়ে আসে।—সব পদার্থের সচ্ছিদ্রতা তো সমান নয়। যেমন, একটা রবারের বেলুনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস রাখলে গ্যাসটি তাড়াতাড়ি রবারের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাসটিকে লোহার পাত্রের মধ্যে রাখলে হাইড্রোজেন গ্যাস মোটেই বের হতে পারে না। কোন পাত্রের দেওয়াল ভেদ করে গ্যাসের এইভাবে বাইরে বেরিয়ে যাওয়াকেও ব্যাপন বলা হয়। অমসৃণ মাটির পাত্র, পোর্সিলেন, প্লাস্টার অফ প্যারিসের পাত্র প্রভৃতি সচ্ছিদ্র পদার্থ। এগুলির মধ্যে দিয়ে গ্যাসের এই রকম ব্যাপন সহজেই হয়।

বিভিন্ন গ্যাসের ব্যাপন ক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে টমাস গ্রাহাম গ্যাসের ব্যাপন সম্পর্কে যে সূত্রটি আবিষ্কার করেন সেটি এই রকম :

"নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় গ্যাসের ব্যাপনের হার গ্যাসটির আপেক্ষিক ঘনত্বের বর্গমূলের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।"

এখানে ব্যাপনের হার বলতে কোনও একটি নির্দিষ্ট আবদ্ধ পাত্রের সচ্ছিদ্র দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে যে আয়তন (মিলিলিটার) গ্যাস প্রতি সেকেণ্ডে বেরিয়ে আসে, তাকেই বোঝায়। যদি v মিলিলিটার গ্যাস t সেকেণ্ডে বেরিয়ে আসে, তাহলে সেই গ্যাসের ব্যাপনের হার প্রতি সেকেণ্ডে $\frac{v}{t}$ মিলিলিটার। তার মানে :—

$$\text{ব্যাপনের হার} = \frac{\text{বাইরে আসা গ্যাসের আয়তন (মিলিলিটারে)}}{\text{সময় (সেকেণ্ডে)}}$$

এখানে মনে রাখা দরকার যে, চাপ ও উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের ব্যাপন হারও বৃদ্ধি পায়।

ব্যাপনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, এই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানগুলিকে পৃথক করা যায়। অনেক সময় পোর্সিলেন দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গ্যাস-মিশ্রণকে বার বার পাঠিয়ে লঘু গ্যাসকে পৃথক করা হয়। একে, বলা হয় অ্যাটমোলিসিস (atmolysis) বা 'চাপ-বিশ্লেষণ'। ব্যাপন পদ্ধতি তথা গ্রাহামেব ব্যাপন সূত্র প্রয়োগ করে গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্ব এবং আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। এ ভিন্ন কয়লার খনিতে মার্স গ্যাসের উপস্থিতিজনিত বিপদ সংকেত জ্ঞাপক যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ব্যবহৃত হয় তাতে ব্যাপনক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ

দেখা যায়।

টমাস গ্রাহাম গ্যাসের ব্যাপন সূত্র আবিষ্কারের পর তরলের ব্যাপনক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর গবেষণার ফল হিসাবে 'অসমোসিস' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে এবং আমরা কলয়ডীয় দ্রবণ ও ক্রস্ট্যালয়েড দ্রবণের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হই। গ্রাহাম একটি বেলজারের এক মুখ পার্চমেণ্ট কাগজ দিয়ে বন্ধ করে সেই মুখটিকে পাতিত জলপূর্ণ অন্য একটি পাত্রের মধ্যে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখেন। বেলজারের মধ্যে অনিয়তাকার পদার্থের (শিরিষ আঠা, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি) জলীয় দ্রবণ এবং স্ফটিকাকার পদার্থের (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি) জলীয় দ্রবণ এর মিশ্রণ রাখেন। এরপর গ্রাহাম লক্ষ্য করেন যে, পার্চমেণ্ট কাগজের মধ্যে দিয়ে অনিয়তাকার পদার্থের দ্রবণ খুব সামান্য পরিমাণে বেরিয়ে আসে কিন্তু স্ফটিকাকার পদার্থের দ্রবণ দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসে বাইরের পাত্রের পাতিত জলে মিশে যায়। গ্রাহাম প্রথম শ্রেণীর অনিয়তাকার পদার্থগুলির নাম দেন 'কলয়েড' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ স্ফটিকাকার পদার্থ গুলির নাম দেন 'ক্রস্ট্যালয়েড'। কলয়ডীয় পদার্থকে এইভাবে ক্রস্ট্যালয়েড পদার্থ থেকে পৃথক করার প্রণালীর নাম ঝিল্লী-বিশ্লেষণ, ইংরেজীতে 'ডায়ালিসিস'।

যখন কোন দ্রাবকের মধ্যে অন্য কোন অদ্রাব্য পদার্থের সূক্ষ্ম কণা ($10^{-5}-10^{-7}$ সেন্টিমিটার ব্যাস) প্রলম্বিত অবস্থায় থেকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় অথচ দ্রবীভূত হয় না, তখন সেই অস্বচ্ছ অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে কলয়ডীয় দ্রবণ বলে। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে ক্রস্ট্যালয়েড ও কলয়েড হলো পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা। পদার্থ কণার ব্যাসের উপর এই অবস্থা নির্ভরশীল। একই পদার্থ অবস্থা বিশেষে কখনও কলয়েড আবার কখনও ক্রস্ট্যালয়েডের ধর্ম প্রকাশ করতে পারে।

'অসমোসিস' প্রক্রিয়ার নাম একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এর অর্থ জানা দরকার। সূক্ষ্ম পর্দার মধ্যে দিয়ে জল বা অন্য কোন দ্রাবক পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয়, তারই নাম 'অসমোসিস'। পার্চমেণ্ট কাগজের মত সূক্ষ্ম পদার্থের ভেতর দিয়ে দ্রাবক পদার্থ নিঃসৃত হতে পারে কিন্তু দ্রাব্য পদার্থ নিঃসৃত হতে পারে না, পর্দায় আটকে যায়। দু'টি অসমান ঘনত্বের দ্রবণের মধ্যে এইরকম সূক্ষ্ম পর্দা রেখে দিলে অল্প ঘনত্বের দ্রবণ থেকে দ্রাবকের এই অসমোসিস গতির প্রভাবে জল বা অন্য কোন তরল দ্রাবক পদার্থ বেশী ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

কলয়ডীয় রসায়নের জনক টমাস গ্রাহাম ফসফোরিক অ্যাসিড সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। 1836 সালে তিনি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। 1841 সালে তিনি ঐ সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। 1854 সালে গ্রাহামকে ট্যাঁকশালের অধিকর্তার পদে নিযুক্ত করা হয়। 1876 সালে তুই রসায়ন বিজ্ঞানী ইয়ং ও স্মিথ, গ্রাহামের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র সংগ্রহ করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 660 পৃষ্ঠা সম্বলিত সেই গবেষণাপত্রটি রসায়নবিদদের কাছে আজও একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে পরিগণিত হয়। তুঃখের বিষয় টমাস গ্রাহাম নিজের জীবদ্দশায় তাঁর গবেষণাপত্রের প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি।



লর্ড কেলভিন

[উইলিয়ম টমসন] (1824—1907)

আবহাওয়া দপ্তর থেকে কোনও একদিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা 303° বলে ঘোষণা করা হলো। ঘোষণাটি শুনে কেউ কেউ মন্তব্য করলো ঃ আবহাওয়া দপ্তরের থার্মোমিটারটি নিশ্চয়ই বিগড়েছে কিংবা থার্মোমিটারের পাঠ নিতে ভুল হয়েছে।—কিন্তু না, আবহাওয়া দপ্তরের ভুল হয়নি। তাঁরা পরম উষ্ণতার স্কেলে ঐ উষ্ণতা মেপে তা প্রচার করেছিলেন মাত্র। পরম উষ্ণতার স্কেলকে আবিষ্কর্তার নামানুসারে 'কেলভিন স্কেল'ও বলা হয় এবং উষ্ণতামাপক এই স্কেলে 30° সেলসিয়াস (সেন্টিগ্রেড) 303° পরম উষ্ণতার সমান হয়, অর্থাৎ 30°C = 303°A বা K [পরম উষ্ণতাকে ইংরেজীতে অ্যাবসল্যুট (A),

কখনও বা কেলভিন (K) নামে অভিহিত করা হয়।] পরম উষ্ণতার স্কেলে জলের স্ফুটনাংক 373°K এবং হিমাংক 273°K. সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস উষ্ণতার সঙ্গে 273° যোগ করলেই কেলভিন বা অ্যাবসল্যুট স্কেলের উষ্ণতা পাওয়া যায়।

পরম উষ্ণতা মাপক স্কেল-এর আবিষ্কর্তা হলেন 'উইলিয়ম টমসন' পরবর্তী কালে যিনি 'লর্ড কেলভিন' নামে বিশ্ববিশ্রুত হয়েছিলেন।

1824 সালের 26শে জুন তারিখে উইলিয়ম টমসনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা 'জেমস টমসন' আয়ারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বেলফাস্ট-এর রাজকীয় মহাবিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বহুকাল আগে এই টমসন পরিবার ধর্মীয় কারণে স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে আয়ারল্যাণ্ডে চলে আসেন।

মাত্র আট বছর বয়সে উইলিয়ম মাতৃহারা হন। তখন তাঁর পিতা অধ্যাপক জেমস টমসন স্বদেশে অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক জেমস পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার জনক ছিলেন। উইলিয়ম তাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন উইলিয়ম। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। শুধু তাই নয়, ল্যাটিন, গ্রীক, তর্ক-শাস্ত্র, রসায়ন, প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy) ও উচ্চতর গণিতে সতীর্থদের চাইতে অনেক এগিয়ে থাকেন।

1841 সাল।

উইলিয়ম ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়তে লাগলেন উচ্চতর গণিত শাস্ত্র। অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন ছাত্রটির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মিললো। গণিত শাস্ত্রের উপর লেখা উইলিয়মের কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো 'কেম্ব্রিজ ম্যাথেমেটিক্যাল জার্নালে'। সতেরো কি আঠারো বছর বয়সের এক ছাত্রের পক্ষে এ এক দুর্লভ সম্মান।

শুধু লেখাপড়াই নয়, উইলিয়ম সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো এবং গান-বাজনাতেও পারদর্শী ছিলেন। কিছুকাল তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মিউজিক্যাল সোসাইটি'র সভাপতির পদও অলংকৃত করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে উইলিয়ম টমসন চলে যান প্যারিসে। এক বছর সেখানে 'হেনরী রেনো'র (Henri Regnault) কাছে পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেন, সেইসঙ্গে তাঁর গবেষণাগারে কিছু কাজও করেন।

— প্যারিস থেকে ফিরে তিনি বিজ্ঞানী 'জেমস প্রেসকট জুল' এর সংস্পর্শে

আসেন। জুল সেই সময় তড়িৎ, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তির পারম্পরিক রূপান্তর বিষয়ে গবেষণা করছিলেন।

1846 সালে উইলিয়ম টমসন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই জীবনের পরবর্তী 53টি বছর কাটিয়ে দেন— অধ্যাপনা ও গবেষণা করে।

অধ্যাপকরূপে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন টমসন। খুব সরস করে বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনি। তবে খুব উঁচু মানের বক্তৃতা বলে ভালো ছেলেরাই তার থেকে উপকৃত হতো বেশী। বক্তৃতার মাঝে দৈবাৎ যদি কোন নতুন বিষয়ের কথা তাঁর মনে পড়ে যেতো, তখনই তিনি সেই নতুন বিষয় বা সমস্যাটি নিয়ে এতো চিন্তামগ্ন হ'য়ে পড়তেন যে মূল বক্তৃতার বিষয়বস্তুর কথা একেবারেই ভুলে যেতেন।—এমনিভাবে বক্তৃতার মাঝে অন্য সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে ও তার সমাধান ঘটিয়ে তিনি বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে আবিষ্কার।—এ এক অভিনব ঘটনা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে উইলিয়ম টমসন ভিন্ন বোধহয় আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, যিনি বক্তৃতাদানকালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন।

তত্ত্ব ও প্রয়োগ—বিজ্ঞানের উভয় দিকেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। থার্মোডাইনামিক্স-এর তত্ত্ব, এনট্রপি, তড়িৎ-চুম্বকীয় দোলন ও বিকিরণ বিষয়ে তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণাগুলি উল্লেখযোগ্য। নিম্ন উষ্ণতার পদার্থ বিজ্ঞান বা ক্রায়োজেনিক্স (cryogenics) গড়ে ওঠার মূলে উইলিয়ম টমসনের অবদান যথেষ্ট। বিজ্ঞানী জুল-এর সহযোগিতায় তিনি প্রমাণ করেন যে, কাজ না ক'রে কোন গ্যাস প্রসারিত হ'লে তা সামান্য শীতল হয়।—'জুল-টমসন ক্রিয়া'-র মূল কথা এইটাই। আবার গ্যাসীয় পদার্থের অণুর গতি-শক্তি সম্পর্কিত তত্ত্বের মূলে আছে এই 'জুল-টমসন ক্রিয়া'। কার্নো (Carnot) এবং জুল (Joule) এর গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে টমসন আবিষ্কার করেন তাঁর বিখ্যাত অ্যাবসল্যুট স্কেল বা কেলভিন স্কেল থার্মোমিতি।

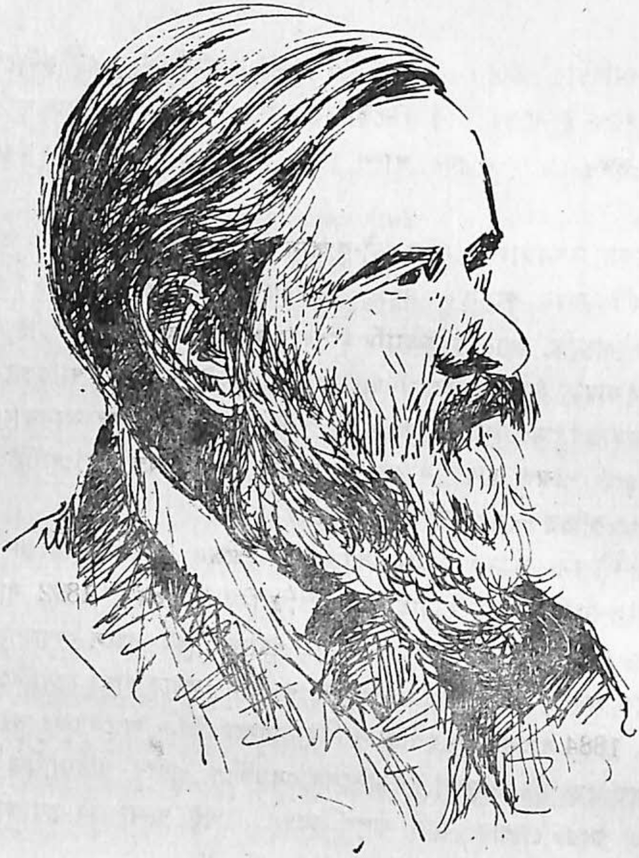
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন উইলিয়ম টমসন। আয়ারল্যাণ্ড ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এর মধ্যবর্তী স্থানে দু' হাজার মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফের তার তিনি সাফল্যের সঙ্গে স্থাপন করতে সমর্থ হন। সাবমেরিন টেলিগ্রাফির ক্ষেত্রে টমসন তাঁর তড়িৎ-বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে 'মিরার গ্যালভ্যানোমিটার' আবিষ্কার ক'রে টেলিগ্রাফের অতি দুর্বল ডট ও ড্যাশ সংকেতগুলির মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হন। 'মুভিং কয়েল গ্যালভ্যানো-

মিটার' আবিষ্কার তাঁর কৃতিত্বের এক অভিনব নিদর্শন। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকে নামের পাশে তিনি 'স্যার' উপাধি ব্যবহার করতে থাকেন।

নাবিকেরা তখনকার দিনে যে নৌ-কম্পাস ব্যবহার করতো, থমসন তার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। সমুদ্রের জোয়ারের উপর গবেষণা করে তিনি জোয়ারের প্রকৃতি, প্রাবল্য ইত্যাদি মাপবার জন্যে 'টাইডাল গজ', 'টাইডাল অ্যানালাইজার' ইত্যাদি যন্ত্র নির্মাণ করেন।—এই সব যন্ত্র আবিস্কারের ফলে তখনকার দিনের নাবিকদের সমুদ্র পথে চলাচলের বিপদ অনেকাংশে লাঘব হয়। শব্দের দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র 'ফ্যাদোমিটার' আবিষ্কারের কৃতিত্বও স্যার উইলিয়ম টমসনের।

সারা জীবনে অনেক সম্মান লাভ করে গেছেন এই কৃতী বিজ্ঞানী। 1890 সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। 1892 সালে তিনি 'লর্ড কেলভিন' নামে পরিচিত হন। পঁচাত্তর বছর বয়সে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর লর্ড কেলভিন লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন। 1884 সালে জন্‌স হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্ব বিষয়ে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলিকে এবার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে লেখার কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 1904 সালে।

1907 সালে লর্ড কেলভিনের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন ও আরও অনেক কৃতী পুরুষের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়।



স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারো

(1826—1910)

ইটালী দেশের অন্তর্গত সিসিলিতে খ্যাতনামা রসায়ন বিজ্ঞানী স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারো জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম সন 1826 খ্রীষ্টাব্দ। স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে ক্যানিজারো চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তারপর কয়েক বছর তিনি গবেষণা করেন শারীর বিজ্ঞান নিয়ে। এই সময় তাঁর প্রত্যয় হয় যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরপর থেকে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

1845 খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা রসায়নবিদ র‍্যাফায়েল পিরিয়ার সঙ্গে ক্যানিজারোর পরিচয় হয়। ক্যানিজারো পিসায় গিয়ে পিরিয়ার গবেষণাগারে তাঁর সহকারী হিসাবে বছর ছয়েক কাজ করেন। সেই সঙ্গে উচ্চতর রসায়ন বিজ্ঞান

নিয়েও যথেষ্ট পড়াশুনা করেন। 1851 থেকে 1871 সাল পর্যন্ত ক্যানিজারো ইটালী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

বিদ্যালয় স্তরে রসায়ন বিজ্ঞান যারা পড়ে তাদের সবাইকে জানতে হয় 'ক্যানিজারোর বিক্রিয়া'। ক্যানিজারোর নামের সঙ্গে এই বিক্রিয়াটির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে এই বিক্রিয়াটির কথা বলা দরকার।

যে সমস্ত অ্যালডিহাইড যৌগে আলফা হাইড্রোজেন নেই তারা তীব্র ক্ষার দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক অণু অ্যালকোহল এবং এক অণু অ্যাসিড (ব্যবহৃত ক্ষারের ধাতব লবণরূপে) উৎপন্ন করে। ফর্ম্যালডিহাইড, বেনজ্যালডিহাইড ইত্যাদি অ্যালডিহাইড যৌগে আলফা হাইড্রোজেন থাকে না বলে এইসব অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে ক্যানিজারোর বিক্রিয়া হয়। অ্যালডিহাইডের –CHO মূলকটির সঙ্গে সরাসরি যে কার্বন পরমাণুটি যুক্ত থাকে তাকে আলফা কার্বন পরমাণু বলে। আর এই আলফা কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুকে আলফা হাইড্রোজেন বলে। ক্যানিজারোর বিক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো দুই অণু ফর্ম্যালডিহাইডের সঙ্গে এক অণু কস্টিক সোডার বিক্রিয়ায় এক অণু মিথাইল অ্যালকোহল ও এক অণু সোডিয়াম ফরমেট যৌগ উৎপন্ন হওয়া। আবার এই ক্যানিজারোর বিক্রিয়া অনুযারী বেঞ্জ্যালডিহাইড ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় একই সঙ্গে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া সংঘটিত হ'য়ে বেঞ্জাইল অ্যালকোহল ও পটাসিয়াম বেনজোয়েট যৌগ উৎপন্ন হয়।

এই বিক্রিয়াটির সঙ্গে ক্যানিজারোর নাম জড়িত থাকলেও রসায়ন বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী ক্যানিজারোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভবতঃ অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্পের সংশোধিত রূপ দান করা। আমেদিও অ্যাভোগাড্রো তাঁর বিখ্যাত প্রকল্পে বলেছিলেন: সম চাপ ও সম উষ্ণতায় সম আয়তন যে কোন গ্যাসে সম সংখ্যক ক্ষুদ্রতম কণা থাকে। এখন এই ক্ষুদ্রতম কণা কথাটি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কেউ বলেন, ঐ ক্ষুদ্রতম কণিকা 'পরমাণু' ভিন্ন আর কিছুই নয়। আবার কেউ বলেন, তা নয়। ক্ষুদ্রতম কণিকা বলতে অণুকে বোঝানো হয়েছে। স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারো এই শেষোক্ত মতটি পোষণ করতেন। তিনি 1858 খ্রীষ্টাব্দে স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেন যে অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্পে উল্লিখিত ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু নয়—অণু। ক্যানিজারোর এই ব্যাখ্যার ফলে অণু ও পরমাণুর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—এ ভিন্ন ক্যানিজারো মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের সংজ্ঞাও নির্দিষ্ট করে দেন। ক্যানিজারোর আর

একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 'স্যানটোনিন'-এর গঠন প্রকৃতি নির্ণয়। রসায়ন বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে 1891 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি ক্যানিজারোকে কোপ্‌লে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

1815 খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক সময় প্রথম নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইটালী আটটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়। সিসিলি অন্তর্ভূক্ত হয় কুখ্যাত বুরবোঁ শাসিত নেপল্‌স এর সঙ্গে। সিসিলির জাতীয়তাবাদী অনেক দেশপ্রেমিকের মতো বিজ্ঞানী ক্যানিজারোও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। 1848 সালে নেপল্‌সে যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটলো তখন ক্যানিজারো ল্যাবরেটরী ছেড়ে বন্দুক হাতে তুলে নিলেন। যোগ দিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের দলে। বিপ্লবীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। বুরবোঁ শাসন থেকে দেশকে তাঁরা মুক্ত করলেন। বিজ্ঞানী ক্যানিজারোকে সিসিলির পার্লামেণ্টের সদস্য মনোনীত করা হলো। কিন্তু পরের বছরেই প্রতিবিপ্লবী রাজশক্তি আবার ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্রই ক্যানিজারো সিসিলিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হলেন। তিনি তখন আশ্রয় নিলেন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে। সেখানে বছর দেড়েক ছিলেন ক্যানিজারো। ঐ সময়ের মধ্যে প্যারীর শেভ্রই এর ল্যাবরেটরীতে সায়ানামাইড নিয়ে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

1851 সালে স্বদেশে ফেরার ডাক আসে। সে ডাকে সাড়া দেন ক্যানিজারো। দেশে ফিরে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।

এদিকে 1860 সালের মধ্যে ইটালীর খণ্ডরাজ্যগুলির প্রায় সব কটিই আবার একত্রিত হয়ে যায়। সিসিলিও বুরবোঁ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ইটালীর মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। ক্যানিজারোর স্বপ্ন সফল হয়। বাকি জীবনটা তিনি দেশে থেকেই বিভিন্ন সরকারী বৈজ্ঞানিক সংস্থায় উপদেষ্টা এবং অধ্যাপনা ও গবেষণা করে কাটিয়ে দেন। স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারোকে বলা যায় পুনর্গঠিত ইটালীর বিজ্ঞান শিক্ষার রূপকারদের পথিকৃৎ।



লর্ড লিস্টার

(1827—1912)

যে সময়ের কথা বলছি, তখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মতো শল্য-চিকিৎসাও ছিল অনুন্নত। সময়টা 1840 সাল। সে সময়কার লণ্ডনের হাসপাতালের শল্য চিকিৎসা বিভাগের একটা চিত্র তুলে ধরা যাক্।

অস্ত্রোপচার কক্ষ।

টেবিলের উপর এক রোগী শুয়ে আছে। তার পায়ে টিউমার হয়েছে। অস্ত্রোপচার করে সেটিকে বাদ দেওয়া হবে এখনই। শল্য চিকিৎসক অস্ত্রোপচার কক্ষে ঢুকলেন। গায়ে তাঁর রক্তের দাগ লাগা একটি জামা। সে রক্ত জামায় লেগেছে পূর্ববর্তী রোগীর অস্ত্রোপচারের সময়। চিকিৎসকের জামার বোতাম থেকে ঝুলছে একটি সুতো। সুতোর এক প্রান্তে লাগানো সূঁচ। সেই সূঁচ ও সুতো দিয়ে অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান সেলাই করবেন শল্য চিকিৎসক।

চিকিৎসক প্রস্তুত। প্রস্তুত তাঁর সহযোগীবৃন্দ। সহযোগীদের একজন রোগীর মাথা, অপরজন রোগীর দুই হাত এবং তৃতীয়জন দুই পা চেপে ধরলেন। ভয়ে রোগী আঁতকে উঠলো, কিন্তু তখন তার একটুও নড়বার জো নেই। শল্য চিকিৎসক ধারালো একটি ছুরির ফলা তাঁর জামায় পুঁছে নিলেন। তারপরই শুরু করলেন অস্ত্রোপচার। খুব তাড়াতাড়িই কাজ সারতে লাগলেন তিনি, কারণ রোগী তখন যন্ত্রণায় পরিত্রাহে চেঁচাচ্ছে ও ছট্‌ফট্ করছে!

শেষ হলো অস্ত্রোপচার। কিন্তু সামান্য ঐ অস্ত্রোপচার যে সফল হলো, তা বলা চলে না। কারণ তখনকার দিনে অস্ত্রোপচারের পর খুব কম সংখ্যক রোগীই সেরে উঠতো। অজ্ঞাত কারণে ক্ষতস্থান পচে যেতো অধিকাংশ রোগীরই। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো সে। পচন নিবারক শল্য চিকিৎসার জনক 'জোসেফ লিস্টার' এর আবির্ভাবের আগে শুধু লণ্ডন কেন, সব দেশেরই হাসপাতালগুলির শল্য চিকিৎসা বিভাগের এই দশা ছিল।

জোসেফ লিস্টারের বাবা জোসেফ জ্যাকসন লিস্টার লণ্ডনের এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিজ্ঞান চর্চাও করতেন। তবে সেটা সখ করে। তিনি উন্নত ধরনের লেন্স তৈরি করেছিলেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিশারদও ছিলেন।—এক কথায় তিনি ছিলেন সখের বিজ্ঞানী।

1827 সালের এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে জোসেফ জ্যাকসন লিস্টারের চতুর্থ সন্তান জোসেফ লিস্টারের জন্ম হয়। এই সন্তানটিকে বিজ্ঞানী হিসাবে গড়ে তুলতে মনস্থ করেন জ্যাকসন লিস্টার। পয়সার অভাব না থাকায় ছেলের জন্যে সেরা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। ছেলেকে তিনি শিখিয়েছিলেন সময়ের সদ্ব্যবহার করতে। লেখাপড়ার অবসরে বালক জোসেফ লিস্টার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতেন। হরেক রকম ফুল, পাতা, কীট-পতঙ্গ, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে জোসেফ সেগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করতেন। ছুরি দিয়ে কখনও লতা-পাতা, কখনও ফুল-ফল, কখনও বা প্রাণি ও উদ্ভিদ দেহ কেটে তিনি তাদের গঠন প্রকৃতি জানবার চেষ্টা করতেন।—এক কথায়, ছেলেবেলা থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক ক্ষুদে প্রকৃতি বিজ্ঞানী।

কাটা-ছেঁড়ার প্রতি ছেলের আসক্তি দেখে বাবা জ্যাকসন লিস্টার তখনই অনুমান করেছিলেন, এ ছেলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই শল্য চিকিৎসক হবে। কিন্তু

এই বৃত্তিটি (শল্য চিকিৎসকের বৃত্তি) জ্যাকসনের মোটেই পছন্দ ছিল না। তিনি বলতেন, ওটা হলো কষাইদের বৃত্তি। সব বৃত্তির নিকৃষ্ট বৃত্তি। তবুও বড় হয়ে ছেলে যখন শল্য চিকিৎসকের বৃত্তি বেছে নিলো, তখন বাপ তাতে বাধা দিলেন না।

মাত্র সতের বছর বয়সে জোসেফ লিস্টার ভর্তি হলেন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে। প্রথম তিন বছর তিনি ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করে 1847 সালে এখান থেকে স্নাতক হয়ে বেরুলেন। তারপর ভর্তি হলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই মেডিক্যাল স্কুলে। মেডিক্যাল স্কুলের পড়াশুনায় খুব ভাল ফল করতে লাগলেন। বিশেষ করে শল্য চিকিৎসায় লিস্টারের আগ্রহ ছিল খুব বেশী। এখানে অধ্যাপকরূপে তিনি পেয়েছিলেন, তখনকার দিনের খ্যাতনামা সার্জেন বা শল্য চিকিৎসকদের।

একটা বিশেষ গুণ ছিল জোসেফ লিস্টারের চরিত্রে। সেটি হচ্ছে, নিজে যাচাই না করে অপরের কথা তিনি মানতেন না। বইতে মানবদেহের গঠন প্রণালী পড়তেন, কিন্তু শব-ব্যবচ্ছেদ করে বইয়ের কথার সত্যতা যাচাই ক'রে নিতেন। ছাত্রাবস্থায় কেবলমাত্র পাঠ্য বই পড়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন না; বহু বিষয় নিজে পরীক্ষা করে জেনে নিতে চেষ্টা করতেন। তাঁর গবেষক জীবনের সূত্রপাত হয় এমনিভাবে—ছাত্রাবস্থাতেই। আরও একটা চারিত্রিক গুণ ছিল জোসেফ লিস্টারের। সেটা হচ্ছে—প্রবল স্মৃতিশক্তি। একবার যা পড়তেন বা দেখতেন, তা আর ভুলতেন না।

মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্রাবস্থায় দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করার ফলে লিস্টারের স্বাস্থ্য 1848 সালে ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি বেশ কয়েকমাস বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। তবুও অনার্স সহ তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করেন। 1850 সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালে লিস্টার আবাসিক সার্জেন পদে নিযুক্ত হন। দু' বছর পরে তিনি রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্স এর সভ্য মনোনীত হন। তারপর উচ্চ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে তিনি এডিনবার্গে চলে যান। সেখানে বিখ্যাত স্কচ শল্য চিকিৎসক ও অধ্যাপক 'সাইম' এর অধীনে পড়াশুনা ও কাজ করার সুযোগ পান। অধ্যাপক সাইমের কন্যা অ্যাগনেসকে তিনি এই সময় বিয়ে করেন।

লিস্টার এডিনবার্গে সাত বছর ছিলেন। এই সময় তিনি অধ্যাপক সাইমের কাছ থেকে অস্ত্রোপচারের উন্নত কলাকৌশল সুন্দরভাবে শিখে

ফেলেন। শল্য চিকিৎসক রূপে তিনিও সুনাম অর্জন করেন।

অস্ত্রোপচারের পর রোগীর ক্ষতস্থানে যে পচন শুরু হয় তার মূলে আছে অদৃশ্য জীবাণু। লুই পাস্তরের গবেষণাপত্রগুলি পড়ে লিস্টারের এই ধারণা জন্মে। আর জীবাণুরা আসে দূষিত বায়ু থেকে। অদৃশ্য ঐ জীবাণুদের ধ্বংস করার উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য বা ওষুধ-এর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে লিস্টার অবশেষে খুঁজে পান একটি ভাল জীবাণুনাশক। নাম তার 'কার্বলিক অ্যাসিড'। 1865 সাল থেকে তিনি কার্বলিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণকে জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহার করে সুফল পান। হাসপাতালে যেখানে শতকরা 45 জন রোগী ক্ষতস্থান পচনের ফলে আগে মারা যেতো, কার্বলিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়ে ক্ষতস্থান জীবাণুমুক্ত করার ফলে মৃত্যুর হার কমে দাঁড়ালো শতকরা পনেরতে। এটা এক মস্ত বড় কৃতিত্ব বৈকি। লিস্টার অস্ত্রোপচারের ছুরি, কাঁচি, এমনকি ক্ষতস্থান সেলাইয়ের সূঁচটিকে পর্যন্ত কার্বলিক অ্যাসিড দ্রবণ দিয়ে জীবাণুমুক্ত ক'রে তবেই অস্ত্রোপচারে ব্রতী হতেন।

সব ভাল কাজেই বাধা আসে। নতুন তত্ত্ব বা তথ্যকে সহজে কেউ গ্রহণ করতে চায় না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। প্রাচীনপন্থী শল্য চিকিৎসকেরা লিস্টারের এই সাফল্য প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও কার্বলিক অ্যাসিডকে জীবাণুনাশক ওষুধরূপে গ্রহণে সম্মত হন নি প্রথমে। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার দেহে এই সময় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। অস্ত্রোপচার ক'রে মহারাণীর দেহের ক্ষতস্থান কার্বলিক অ্যাসিড সহযোগে জীবাণুমুক্ত করে লিস্টার তাঁকে দ্রুত সারিয়ে তোলেন; মহারাণী ভিক্টোরিয়া খুশী হয়ে লিস্টারকে তখন 'ব্যারন' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং হাউস অফ লর্ডসের সভ্য মনোনীত করেন। তখন থেকে জোসেফ লিস্টার 'লর্ড লিস্টার' নামে পরিচিত হন। সুদক্ষ শল্য চিকিৎসকরূপে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অস্ত্রোপচারে কার্বলিক অ্যাসিডকে জীবাণুনাশক পদার্থরূপে গ্রহণে এতদিন যাঁরা ছিলেন অনাগ্রহী, তাঁরাও এখন থেকে লিস্টার প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। বলা বাহুল্য, তাতে তাঁরাও সুফল পান। অস্ত্রোপচারের পর যে সব রোগীর মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী, তাদের অধিকাংশই দ্রুত সুস্থ হ'য়ে উঠতে থাকে।

এদিকে 'লর্ড লিস্টার' লণ্ডনের কিংস কলেজের শল্য চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং সেখানে দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনা ও গবেষণা

করতে থাকেন। গোটা বিশ্বে তখন লর্ড লিস্টার প্রবর্তিত 'কার্বলিক অ্যাসিড' জীবাণুনাশকের চলন হয়ে গেছে। অস্ত্রোপচারের পর রোগীর মৃত্যুর হারও গেছে কমে। এই সাফল্য, নিজের জীবদ্দশায় দেখে গেছেন লর্ড লিস্টার। সেটা তাঁর পরম সৌভাগ্য।

1912 সালে লর্ড লিস্টারের কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্ববাসী হারায় এক কর্মনিষ্ঠ ও মানব দরদী শল্য চিকিৎসাবিদকে।



আইভ্যান পেত্রাভিচ প্যাভলভ

(1849—1936)

অনেককাল আগে সোভিয়েত রাশিয়ায় বড় বড় শহরের পথে প্রায়ই ব্যাণ্ড বাজানো হতো। লোকে বলতো : ব্যাণ্ড বাদকদের সামনে দাঁড়িয়ে কখনও লেবু চুষো না। তাহলে ব্যাণ্ড বাজনা যাবে থেমে।—কেন থেমে যাবে? এ প্রশ্ন করলে তারা বলতো : লেবু চুষতে দেখলেই ওদের মুখে লালা আসে। সেই লালা এসে বাঁশী ও তার সমজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের মুখ বন্ধ করে

দেয়। ফলে বাঁশী বাজে না। ব্যাণ্ড বাজনা ব্যহত হয়।

—এ ঘটনা সত্যি কি মিথ্যে সেটা বড় কথা নয়। তবে একথা সত্যি যে মানুষ জ্ঞাতসারে বা সজ্ঞানে মুখের লালা নিঃসরণ বন্ধ করতে পারে না। 1903 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী আইভ্যান প্যাভলভ একাধিক পরীক্ষা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেন। আইভ্যান প্যাভলভকে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শারীর বিজ্ঞানী আখ্যা দেওয়া হয়। 1904 সালে পরিপাক ক্রিয়ার শারীর বিজ্ঞান তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যে প্যাভলভ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম রাশিয়ান, যিনি নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

1849 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 14 তারিখে আইভ্যান পেত্রাভিচ প্যাভলভের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রাশিয়ার রিয়াসান গ্রামের পুরোহিত ছিলেন। আইভ্যানের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ঐ গ্রামেরই চার্চ স্কুলে। ছেলেবেলা থেকেই আইভ্যানের জ্ঞানার্জনের প্রবল স্পৃহা ছিল। স্কুলের লাইব্রেরীতে রুশ বিজ্ঞানীদের লেখা বই তিনি আগ্রহ সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পড়তেন। এইচ. জি. লেওএস-এর লেখা "ব্যবহারিক শারীর বিজ্ঞান" বইখানি পড়ে মানবদেহের কলকজাগুলির ক্রিয়াকর্ম জানবার আগ্রহ জাগে তাঁর মনে। তিনি চিকিৎসক হতে চান।

স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে আইভ্যান প্রথমে লেনিনগ্রাদে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ শেষ করে ভর্তি হন মেডিক্যাল অ্যাকাডেমিতে। ছাত্রাবস্থায় 1878 সালে তিনি যে কয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তার থেকেই তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। 1883 সালে প্যাভলভ সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ মেডিসিন' ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরের বছর সেখানে শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বিদেশে ভ্রমণের জন্যে একটি বৃত্তি পান। সেই বৃত্তির অর্থে তিনি দু'বছরের জন্যে জার্মানীতে যান। সেখানে প্যাভলভ জার্মান ভাষা শেখেন এবং সে দেশীয় অধ্যাপকদের অধীনে কাজ করে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। ইংরেজী ভাষা তিনি ভালভাবে শেখেন নি। ইংরেজীতে গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ না করায় ইংরেজ বিজ্ঞানীরা তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির গুরুত্ব প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

জার্মানী থেকে ফিরে ডক্টর প্যাভলভ পরিপাক ক্রিয়ার উপর তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। 1890 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাশিয়ান

ইনস্টিট্যুট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন'। প্যাভলভকে ঐ ইনস্টিট্যুটের শারীর বিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা পদে নিয়োগ করা হয়। এই পদে যোগ দিয়ে প্যাভলভ প্রথমেই কুকুরের উপর পরীক্ষাকার্য শুরু করেন। কুকুরের পরিপাক গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তার নমুনা প্যাভলভ কুকুরের পাকস্থলী থেকে কৌশলে বের করে নিতেন। তারপর সেই নমুনাগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে পাচক রসের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি গবেষণা করতেন। তখনকার দিনে পরিপাক ক্রিয়ার রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যাবৃত ছিল। প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখেন যে, পরিপাক গ্রন্থি থেকে নির্গত পাচক রস খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করায় একাধিক রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এরপর প্যাভলভ মানুষের পরিপাক ক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে মানুষকে যদি বিভিন্ন পদের কয়েকটি খাদ্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে দীর্ঘকাল ধরে পরপর পরিবেশন করা হয়, তাহলে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। খাদ্য তালিকার পদগুলি পরিবেশনের ক্রমের পরিবর্তন ঘটালে, খাদ্য আগের তুলনায় কম হজম হয়। এ ভিন্ন প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখেন যে, একই খাদ্য সুস্বাদু করে না রাঁধতে পারলে সহজ পাচ্য হয় না কিন্তু তা সুস্বাদু করে রাঁধলে সহজে পরিপাক হয়। —এখনকার দিনে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট বেশী বলে প্যাভলভের পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। কিন্তু যে কালে প্যাভলভ খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, তখন তা সত্যিই মানুষের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল।

1892 থেকে 1897 সালের মধ্যে প্যাভলভ পরিপাক ক্রিয়ার উপর তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্বলিত একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। "The Physiology of the Digestive Glands" নামে এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে ফরাসী ভাষায়, পরে জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে প্যাভলভ সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি শারীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

1897 সালে প্যাভলভকে 'মিলিটারি মেডিক্যাল অ্যাকাডেমিতে' শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। 1904 সালে শারীর বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন প্যাভলভ। 1906 সালে তিনি 'রাশিয়ান

অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সেস’ এর সভ্য মনোনীত হন। পরের বছরই তাঁকে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়।

এবার প্যাভলভের গবেষণা এক নতুন দিকে মোড় নেয়। তিনি একটি কুকুরকে খাবার খেতে দেওয়ার একটু আগে একটি ঘণ্টা বাজাতেন। রোজ এই রকম করার ফলে প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখেন যে ঘণ্টা বাজালেই কুকুরটির লালা নিঃসরণ ঘটে, তারপর তাকে খাবার খেতে দেওয়া হোক বা না হোক। প্যাভলভ বলেন, এক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি কুকুরের উত্তেজনার উদ্রেক করে এবং সেই উত্তেজনায় কুকুর সাড়া দেয় লালা নিঃসরণ করে। উত্তেজনা যেন ক্রিয়া, আর লালা নিঃসরণ তার প্রতিক্রিয়া। প্যাভলভের ভাষায় এর নাম ‘পরিবর্তী প্রতিক্রিয়া’ বা Conditioned reflex। পরিবর্তী প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় মস্তিষ্কের ‘সেরিব্রাল হেমিস্কিয়ার’ নামক অংশ থেকে। 1907 সালে প্যাভলভ পরিবর্তী প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তাঁর বক্তৃতামালা প্রকাশ করেন।

1917 সালে এক দুর্ঘটনায় প্যাভলভের উরুর হাড় ভেঙ্গে যায়। এ সময় তিনি পরীক্ষাগারে গিয়ে কাজকর্ম করতে পারতেন না। প্রাণীর মস্তিষ্ক নিয়ে এতদিন তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তার ফলাফল এই সময় ঘরে বসে লিখে ফেলেন। পরবর্তীকালে সেই রচনাই “Lectures on the work of the Cerebral Hemispheres” নামে একখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্যাভলভ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মানসিক রোগের কারণ যত না মনের, তার বেশী দেহের। এ বিষয়টি নিয়ে তিনি মৃত্যুর বছর দশেক আগে থেকে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর ধারণা হয় যে, বর্তমান সভ্য জগতে দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলিই মানুষের স্নায়বিক বৈকল্য ঘটিয়ে মনোরোগ সৃষ্টি করে। তাঁর এই গবেষণা, মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসার সহায়ক হয়।

1928 সালে প্যাভলভ ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণে যান। রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি ‘ক্রোনিয়ান বক্তৃতা’ দেন। বিদগ্ধ শ্রোতারা গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে খ্যাতনামা এই রুশ বিজ্ঞানীর বক্তৃতা শোনেন।

মানুষ হিসাবে প্যাভলভ ছিলেন খুবই সাদাসিধে প্রকৃতির। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও সময়ানুবর্তী। সময়ের সঙ্গে ছকে বাঁধা ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। ঠিক সকাল আটটায় প্রাতঃরাশ সেরে প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষাগারে চলে যেতেন। পৌছুতেন সাড়ে ন’টায়। বেলা সাড়ে বারোটায়

লাঞ্চ খেতেন। রাতের খাবার খেয়ে নিতেন সন্ধ্যা ছ'টায়। এরপর রাত ন'টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে দশটা থেকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। সময়ের সঙ্গে ছকে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্বদেশের ছাত্র ও যুব সমাজের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন : "জীবনে একটা উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়ে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একাগ্রচিত্তে তোমরা কাজ করে যাও। কখনই ভেবো না যে তুমি সর্বজ্ঞ। অপরে তোমার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলেও তুমি ভেবো যে তুমি কিছুই জান না।"

1936 সালে ছিয়াশি বছর বয়সে এই রুশ জ্ঞান-তপস্বীর দেহাবসান ঘটে কিন্তু তাঁর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।



হেনরী ময়সা
(1852—1907)

যে ফরাসী রসায়নবিদ কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করেছিলেন, 'ইলেকট্রিক আর্ক' নামক চুল্লী উদ্ভাবন করেছিলেন এবং ফ্লোরিন নামক মৌলটিকে পৃথক করার কৃতিত্বের জন্যে রসায়ন বিজ্ঞানে 1906 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে-ছিলেন, তাঁর নাম হেনরী ময়সা।

1852 সালে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে হেনরী ময়সার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ময়সা প্যারী নগরীর এক ঔষধ প্রস্তুতকারকের কাছে কাজ শেখার পর 1872 সাল থেকে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করেন।

রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর গুরু ছিলেন 'ফ্রেমি'। 1879 সালে মঁয়সা প্যারীর অ্যাগ্রোনমিক ইনস্টিট্যুটে চাকরি জীবন শুরু করেন। সাত বছর বাদে 1886 সালে স্কুল অফ ফার্মাসীতে তিনি টক্সিকোলজির অধ্যাপক পদে বৃত হন। এর তিন বছর বাদে মঁয়সা অজৈব রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যাপনা শুরু করেন। 1900 খ্রীষ্টাব্দে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাধারণ রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

রসায়নের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা আছে যে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন—এই চারটি মৌল সমধর্মী। এদের সাধারণভাবে 'হ্যালোজেন' অর্থাৎ সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনকারী নামে অভিহিত করা হয়। 1813 সালে বিজ্ঞানী ডেভি ফ্লোরিন মৌলটির অস্তিত্ব নির্ণয় করেন কিন্তু মৌলটিকে পৃথক করা অজৈব রসায়নবিদদের কাছে দীর্ঘকাল যাবৎ এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ডেভি প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের গঠন হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডের গঠনের অনুরূপ। তার মানে, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিন সদৃশ একটি মৌল যুক্ত থাকে। কিন্তু ক্লোরিন সদৃশ ঐ মৌলটিকে মুক্ত অবস্থায় তখনও পর্যন্ত কেউ পান নি। ডেভি মুক্ত ফ্লোরিন পাওয়ার আশায় হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু সেই তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া গিয়েছিল ফ্লোরিন পাওয়া যায় নি।

কেন ডেভির পরীক্ষায় বা তাঁর পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় মুক্ত অবস্থায় ফ্লোরিন পাওয়া যায় নি, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে। ফ্লোরিনকে মুক্ত অবস্থায় না পাওয়ার চারটি কারণ ছিল। প্রথমত, অন্যান্য মৌলদের প্রতি ফ্লোরিনের রাসায়নিক আসক্তি অতি প্রবল। দ্বিতীয়ত, কাচ কিংবা কার্বন—যে পাত্রেই ফ্লোরিন প্রস্তুতির চেষ্টা হয়েছে, ফ্লোরিন সেই পাত্রের উপাদানের ক্ষয় সাধন করেছে। তৃতীয়ত, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের তড়িৎ বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতি তখনকার দিনে অজানা ছিল। চতুর্থত, নিরুদক হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড অত্যন্ত বিষাক্ত ও ক্ষয়কারক পদার্থ হওয়ার জন্যে তা পরীক্ষাকার্যে লিপ্ত অনেক রসায়নবিদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

রসায়ন বিজ্ঞানী হেনরী মঁয়সা নিম্নলিখিত উপায়ে ফ্লোরিন প্রস্তুতির উপরোক্ত অসুবিধাগুলি দূর করতে সমর্থ হন। তিনি প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়ামের সংকর ধাতু দিয়ে গড়া পাত্র ফ্লোরিন প্রস্তুতির জন্যে ব্যবহার করেছিলেন। এই সংকর ধাতু ফ্লোরিন কর্তৃক সহজে আক্রান্ত হয় না।

ময়সা নিরুদক হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে পটাসিয়াম-হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড নামক যৌগ দ্রবীভূত করে সেই দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষ্যরূপে ব্যবহার করেছিলেন। এই দ্রবণ তড়িতের সুপরিবাহী কিন্তু কেবলমাত্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড তড়িতের সুপরিবাহী নয়। —এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে 1886 সালে ময়সা ফ্লোরিনকে মুক্ত অবস্থায় পৃথক করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তিনি ঐ মৌলটির ভৌতধর্মগুলিও অনুধাবন করেন।

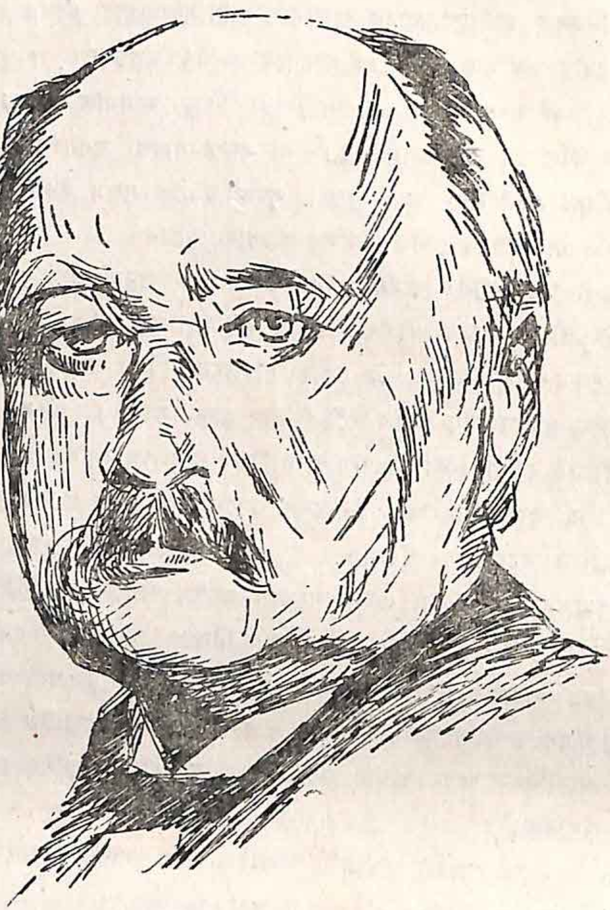
ময়সা 'ইলেকট্রিক ফার্নেস' নামক এক বিশেষ ধরনের চুল্লী উদ্ভাবন করেন এবং ঐ চুল্লীতে অনেক ধাতব অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে পরিণত করতে সক্ষম হন। আবার ঐ চুল্লীর সাহায্যেই তিনি কয়েকটি কার্বাইড, সিলিসাইড ও বোরাইড শ্রেণীর অজৈব যৌগ প্রস্তুত করেন। ময়সা উদ্ভাবিত এই চুল্লীতেই বর্তমানে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের পণ্যোৎপাদন করা হয়।

এ ভিন্ন 'ইলেকট্রিক আর্ক ফারনেস' নামে এক বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক চুল্লী উদ্ভাবন করেছিলেন ময়সা। এই চুল্লীতে অত্যধিক উষ্ণতায় তিনি এ যাবৎ গলানো যেতো না এমন অনেক যৌগকে গলাতে এবং ইউরেনিয়াম, ভ্যানেডিয়াম, টাংস্টেন ইত্যাদি মৌলগুলিকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন।

বিভিন্ন কার্বাইড যোগের উপর জলের বিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ময়সা ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের হাইড্রাইড যৌগগুলি প্রস্তুত করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে এই হাইড্রাইড যৌগগুলি তড়িৎ অপরিবাহী।

মুক্ত অবস্থায় ফ্লোরিন মৌলটি উৎপাদন এবং রসায়ন বিজ্ঞানে অন্যান্য গবেষণার জন্যে হেনরী ময়সা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিখ্যাত এই ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী 1907 সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত অজৈব রসায়নের কয়েকখানি গ্রন্থ আজও মহামূল্যবান বলে পরিগণিত হয়।



স্বাণ্টে আগষ্ট আরেনিয়াস

(1859–1927)

রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 'স্বাণ্টে আগষ্ট আরেনিয়াস' একটি সুপরিচিত নাম। রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই বিজ্ঞানী 1859 সালের 19শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সুইডেনের ভিক শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞান-এর প্রতি আরেনিয়াস আকৃষ্ট হন। সতের বছর বয়সে 1876 সালে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অঙ্ক, পদার্থ বিজ্ঞান

ও রসায়ন বিজ্ঞান পাঠ শুরু করেন। দু'বছর বাদে সেখান থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। 1881 সালে আরেনিয়াস স্টকহোমের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে বিজ্ঞানী এডল্যাণ্ডের অধীনে গবেষণা করতে থাকেন। এই সময় তাঁর মনে এক অভিনব প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি এই রকম: "জল তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থ। লবণও তাই। কিন্তু জলে লবণের দ্রবণ তড়িৎ পরিবাহী।—কেন এমন হয়?"

কাল বিলম্ব না করে আরেনিয়াস এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবার চেষ্টায় ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যে আরেনিয়াস বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ এক একটি ফ্লাস্কে রাখেন। প্রতিটি ফ্লাস্কের গায়ে কাগজের লেবেল লাগিয়ে দ্রবণের মাত্রা ও লবণের নাম লিখে রাখেন। তারপর এক একটি দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিয়ে যে ফল পান, তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রায় পঞ্চাশ রকম লবণের জলীয় দ্রবণ নিয়ে দু'বছর ধরে নিপুণভাবে পরীক্ষা-কার্য চালিয়ে পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করতে করতে তিনি একটি সূত্র খুঁজে পান। সে দিনটা ছিল 1883 সালের 17ই মে। আর 1884 সালে তাঁর গবেষণার ফলাফল সম্পর্কিত গবেষণাপত্র ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন। সেই গবেষণা পত্রটির নাম ছিল "Recherches Sur la conductibilite galvanique des electrolytes" অর্থাৎ কিনা ইলেকট্রোলাইটের গ্যালভ্যানিক পরিবাহিতা বিষয়ক অনুসন্ধান।

আরেনিয়াসের এই গবেষণাপত্র যে পরীক্ষকমণ্ডলীর কাছে পেশ করা হয়, তাঁদের মধ্যে 'পের ক্লেভ' ছিলেন অন্যতম। 'পের ক্লেভ' ছিলেন উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক; হোলমিয়াম ও থুলিয়াম নামক মেটল দুটির আবিষ্কর্তা। তিনি আবার আরেনিয়াসের শিক্ষাগুরুও ছিলেন। ছাত্র আরেনিয়াসের গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়টি তিনি অবিশ্বাস্য বলে মন্তব্য করেন। অন্যান্য পরীক্ষকেরা মন্তব্য করেন যে, আরেনিয়াসের গবেষণাটি অতি নিম্নমানের। চার ঘণ্টা যাবৎ পরীক্ষকমণ্ডলী আরেনিয়াসকে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করেন। আরেনিয়াস সেই সব প্রশ্নের সদুত্তর দেন। ফলে 1884 সালে ঐ গবেষণার জন্যেই তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়।

এর তিন বছর বাদে আরেনিয়াস ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজনের তড়িৎ পরিবাহিতা তত্ত্বের পরিণত রূপটি প্রকাশ করেন। সেই তত্ত্বটি এই রকম: "যখন কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্য জলে দ্রবীভূত করা হয়, তখন তা বিভিন্ন হারে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিয়োজিত হয়। পদার্থের

প্রকৃতি ও তার দ্রবণের মাত্রার উপর এই বিয়োজনের হার নির্ভর করে। জলে দ্রাবের (পদার্থের) মাত্রা যত কম হয়, এই বিয়োজনের হার ততই বাড়ে। এই বিয়োজনের ফলে দ্রবণে অভিস্রবণের চাপও (Osmotic pressure) বৃদ্ধি পায়।"

সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য। সোডিয়াম ক্লোরাইডকে জলে দ্রবীভূত করলে তা সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নে বিয়োজিত হয়—এ কথা সমকালীন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। মেণ্ডেলিভ, লোথার, মেয়ার প্রমুখ খ্যাতনামা রসায়ন বিজ্ঞানীরা আরেনিয়াসের তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন। হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী উইলহেল্‌ম অস্টওয়াল্ড কিন্তু আরেনিয়াসের তত্ত্বকে স্বাগত জানান। 'আয়নে পরিণত হওয়ার ফলে দ্রবণে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে'—আরেনিয়াসের এই তত্ত্বকে তিনি স্বীকার করেন। তিনি রিগায় তাঁর ল্যাবরেটরীতে কাজ করার জন্যে আরেনিয়াসকে আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণ আরেনিয়াস গ্রহণ করেন এবং 1886 সালে রিগাতে গবেষণা করে বিভিন্ন অ্যাসিডের তড়িৎ পরিবাহীতা ও বিক্রিয়া বেগ নিরূপণ করে তাঁর আয়ন তত্ত্বকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর আরেনিয়াস বিজ্ঞানী কোলরাশ, গ্রাজে, বোল্ডস্‌ম্যান, ভ্যাণ্টহফ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণা করার সুযোগ পান। 1886 থেকে 1888 —এই ক'বছরের গবেষণায় আরেনিয়াসের তড়িৎ বিয়োজন তত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করে।

1891 সালে আরেনিয়াস স্টকহোমের টেক্‌নিক্যাল হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ করেন। বছর কয়েক বাদে তিনি ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে বৃত হন।

1887 সালে আরেনিয়াস উষ্ণতার সঙ্গে বিক্রিয়া বেগের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন, ডেভি ও ফ্যারাডে পদক লাভ করেন। 1913 সালে পান রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার। পঁচিশ বছর বয়সে যে গবেষণাপত্র ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্যে দাখিল করেছিলেন আরেনিয়াস, তারই প্রতিপাদ্য বিষয়—আয়ন তত্ত্বের স্বীকৃতিতেই এই নোবেল পুরস্কার লাভ।

নোবেল পুরস্কার লাভের পর আরেনিয়াস আট বছর ধরে (1904 থেকে 1911 সাল পর্যন্ত) আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটি থেকে তাঁকে গিব্‌স পদক দিয়ে সম্মানিত

করা হয়। তখন নোবেল ইনস্টিট্যুট সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 1905 সালে আরেনিয়াস ঐ ইনস্টিট্যুটে ভৌত রসায়ন শাখার প্রধানরূপে যোগদান করেন। 1927 সালের দোসরা অক্টোবর তারিখে এই বিখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে।

আরেনিয়াসের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি যে কেবল রসায়ন-শাস্ত্রবিদ ছিলেন তা নয়। পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায়ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম নক্ষত্রের সংঘর্ষে সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। আবার ধূমকেতু, মেরুজ্যোতি, ছটামণ্ডল ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তাঁর মতবাদ থেকে মেলে। আয়ন তত্ত্বের প্রবক্তা ও বহুমুখী প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইবেন।

লিও হেনড্রিক বেকল্যাণ্ড

(1863—1944)

ব্যাকেলাইট প্লাস্টিকের নাম কে না জানে। ব্যাকেলাইটের তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস আমরা এখনও ব্যবহার করে থাকি। ফেনল-ফরম্যালডিহাইড প্লাস্টিক ও রেজিন-এর ব্যবসায়িক নাম হলো 'ব্যাকেলাইট'। এ জিনিসটির আবার প্রকারভেদ আছে। 'ব্যাকেলাইট'-এ বা 'রেসল' হলো 'থার্মোপ্লাস্টিক' অর্থাৎ উত্তাপ প্রয়োগ করলে এ জিনিসটি প্রয়োজনানুরূপ নমনীয় হয়ে যে কোন আকার ধারন করতে পারে, আবার ঠাণ্ডা হলেই শক্ত হয়ে পড়ে। উত্তাপের সাহায্যে এই পদার্থকে বার বার গলিয়ে নরম করে ফেলা যায়, কিন্তু তার ফলে পদার্থটির স্বকীয় ধর্ম বা গুণের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ব্যাকেলাইট-'বি' বা 'রেসিটল' ও থার্মোপ্লাস্টিক কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থায় এ জিনিসটি জেলির মতো আঠালো অবস্থায় থাকে। আবার ব্যাকেলাইট-'সি' বা 'রেসিট' হলো থার্মোসেটিং প্লাস্টিক, অদ্রবণীয় পদার্থ, উত্তাপেও গলে না। একে একবার তাপ এবং চাপ দিয়ে নরম করে বিশেষ আকার দেওয়া যায় সত্যি, কিন্তু শিল্পদ্রব্যটি ঠাণ্ডা হলে দারুণ শক্ত হয়ে জমে যায়। তখন বদলানো যায় না তার আকৃতি। অর্থাৎ থার্মোসেটিং প্লাস্টিকে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে।

এই যে ব্যাকেলাইট, এর আবিষ্কর্তা হলেন এক রসায়নবিদ, নাম 'লিও হেনড্রিক বেকল্যাণ্ড'। জন্মসূত্রে বেলজিয়ান কিন্তু পরবর্তী জীবনে ইনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। 1905 সালে বেকল্যাণ্ড মানুষের তৈরি প্রথম পলিমার 'ফেনল ফরম্যালডিহাইড রেজিন' বা 'ব্যাকেলাইট' আবিষ্কার করেন।

সতেরো বছর বয়সে লিও বেকল্যাণ্ড রসায়নবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এর চার বছর পরেই সেখান থেকে তিনি 'ডক্টর অফ সায়েন্স' ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

1889 খ্রীষ্টাব্দে বেকল্যাণ্ড তাঁর অধ্যাপক থিওডোর সোয়ার্টস্-এর মেয়ে সেলিনিকে বিয়ে করেন। সেই বছরেই তিনি বেলজিয়াম-এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা

অনুসন্ধান প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার লাভ করে বেকল্যাণ্ড নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সুযোগ পান।

নিউইয়র্ক-এ লিও বেকল্যাণ্ড অধ্যাপক চ্যাণ্ডলার-এর সংস্পর্শে আসেন। অধ্যাপক চ্যাণ্ডলার ছিলেন পাকা জহুরী। এই বেলজিয়ান রসায়নবিদ যুবকটির মধ্যে যে প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন। এটা বুঝতে পেরে তিনি বেকল্যাণ্ডকে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে আমেরিকায় গবেষণা করবার পরামর্শ দেন। অধ্যাপক চ্যাণ্ডলার-এর পরামর্শে উৎসাহিত হয়ে লিও বেকল্যাণ্ড আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেইখানেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত হন।

বেলজিয়াম ত্যাগ করলেও বেকল্যাণ্ড কিন্তু সেদেশে বসবাসকারী তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের ভুলে যান নি। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁদের সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন।

ডক্টর বেকল্যাণ্ডের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর প্রথমে তিনি ফটোগ্রাফিতে আগ্রহশীল হন। 'ভেলক্স' নামে হাইস্পিড ফটোগ্রাফির ফিল্ম আবিষ্কার করে তিনি তাঁর পেটেণ্ট নেন 1887 সালে। 'ভেলক্স' আবিষ্কারের আগে ফটোগ্রাফি ছিল বিত্তশালী ব্যক্তিদের বিলাস। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা জীবিকার্জনের তাগিদে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন বাধ্য হয়ে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'ভেলক্স' উৎপাদনের জন্যে বেকল্যাণ্ড নিউইয়র্কের কাছে ইয়ংকার্স নামে এক জায়গায় 1892 সালে যৌথ মালিকানায় একটি কারখানা গড়ে তোলেন। কম দামে ভাল ফটোগ্রাফিক ফিল্ম উৎপাদন করে বেকল্যাণ্ড ছবি তোলার শিল্পকে সাধারণ মানুষের আয়ত্বে এনে দেন। পেশাদার ফটোগ্রাফারদেরও তাতে সুবিধা হয়। তাদের ব্যবসা বেশ ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

সাত বছর বাদে বেকল্যাণ্ড এবং তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার ঐ কারখানাটি বিক্রী করে দেন ইষ্টার্ণ কোডাক কোম্পানীকে। বেশ ভাল দামেই বিক্রী করেন। তার ফলে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে বেকল্যাণ্ড ধনী হয়ে ওঠেন। হাডসন নদী তীরে এক উঁচু জায়গায় তিনি সুন্দর একটি বাড়ী কেনেন। বাড়ীর নাম রাখেন 'স্নাগরক'। সে বাড়ীর বাসিন্দা তখন চারজন। সস্ত্রীক

বেকল্যাণ্ড, ছেলে জর্জ এবং মেয়ে নীনা।

এইভাবে জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছল্য আসার পর বেকল্যাণ্ড তড়িৎ রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'টাউনসেণ্ড সেল'-কে তিনি উন্নত রূপ দেন এবং তার ফলে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন উৎপাদন সহজতর হয়।

1872 সালে জানা যায় যে, ফর্ম্যালডিহাইড নামক যৌগটি ফেনলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। 1905 সালে ডক্টর বেকল্যাণ্ড এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। শীঘ্রই তিনি মানুষের তৈরি প্রথম 'পলিমার' ফেনল ফরম্যালডিহাইড রেজিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। সদ্য আবিষ্কৃত পদার্থটির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে তিনি ঐ পদার্থটির নাম রাখেন 'ব্যাকেলাইট'। বাকেলাইট আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্লাস্টিক যুগের সূচনা হয়। 1909 সালে ডক্টর বেকল্যাণ্ডের একটি প্রবন্ধ 'জার্নাল অফ্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কেমিষ্ট্রি' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে বেকল্যাণ্ড ব্যাকেলাইট সংশ্লেষণ, তার গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ব্যাকেলাইট আবিষ্কার করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন লিও বেকল্যাণ্ড। তাঁকে 'প্লাস্টিক শিল্পের জনক' আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যাকেলাইটের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিউজার্সির অন্তর্গত পার্থ নামক স্থানে গড়ে ওঠে 'দি জেনারেল ব্যাকেলাইট কোম্পানী'। 1921 সালে এই কোম্পানীর নাম রাখা হয় 'ব্যাকেলাইট কর্পোরেশন'।

লিও বেকল্যাণ্ড ছিলেন এক সার্থক গবেষক ও রসায়নবিদ। জীবদ্দশায় তিনি অজস্র আবিষ্কারের পেটেণ্ট লাভ করেন। 1917 সালে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার নৌ-সেনা দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিভাগের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে ডক্টর বেকল্যাণ্ড ছিলেন হাসিখুশী রসিক মানুষ। তাঁর মনোরম ব্যক্তিত্ব ও উদার প্রকৃতি সকলকে মুগ্ধ করতো। একাশি বছর বয়সে ডক্টর বেকল্যাণ্ডের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু প্লাস্টিক শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি আজও আছেন অমর হয়ে।



ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন
(1877—1945)

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ রসায়ন বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন 1877 সালে বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন ম্যালভার্ন এবং ম্যাসন কলেজে। লেখাপড়া শেষে ওলভারহাম্পটনে এক মদ তৈরির কারখানায় কেমিষ্ট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন অ্যাস্টন। তারপর 1901 সালে কেম্ব্রিজের ল্যাবরেটরীতে গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। অ্যাস্টন সেখানে বিভিন্ন মৌলের আইসোটোপ নির্ণয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা শুরু করেন আইসোটোপ কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

একই মৌলের একাধিক পরমাণুগুলির পরমাণু ক্রমাঙ্ক যদি স্থির থাকে কিন্তু পারমাণবিক গুরুত্বের তারতম্য ঘটে, তবে ঐ বিভিন্ন পরমাণুগুলিকে ঐ মৌলের 'আইসোটোপ' বলে। আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম একই রকম হয়, কারণ মৌলের রসায়নিক ধর্ম নির্ধারিত হয় মৌলের পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রন সজ্জার উপর এবং একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপগুলির মধ্যে সম সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। সম সংখ্যক ইলেকট্রন থাকার অর্থ—পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সম সংখ্যক প্রোটন থাকা।

'ইলেকট্রন' হলো নেগেটিভ তড়িৎ আধানযুক্ত কণিকা, আর 'প্রোটন' পজিটিভ তড়িৎ আধানযুক্ত কণিকা। পরমাণু সামগ্রিকভাবে নিস্তড়িৎ বলে তার মধ্যে সম সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। তাহলে আইসোটোপ-গুলির ভরের তারতম্য হয় কেন?—এটা হয়, পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যের জন্যে। হাইড্রোজেন, কার্বন, ক্লোরিন, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি অনেক মৌলেরই আইসোটোপ আছে।

1909 সালে আট বছর গবেষণার পর অ্যাস্টন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পরের বছরই তিনি ট্রিনিটি কলেজে রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে বৃত হন। যুদ্ধের সময় 1914 থেকে 1917 সাল পর্যন্ত অ্যাস্টন ছিলেন রয়্যাল এয়ারক্রাফ্ট কোম্পানীর 'টেকনিক্যাল হেড'। 1919 সালে অ্যাস্টন আবার ফিরে আসেন ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে এবং গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 1919 সালেই অ্যাস্টন 'মাস স্পেকটো-গ্রাফ' নামে একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

স্যার জে. জে. টমসন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ ক্ষরণের ফলে সৃষ্ট পজিটিভ-রে সমূহকে চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের সাহায্যে বাছাই করার বা পৃথক করার একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। 'মাস স্পেকটোগ্রাফ' পজিটিভ-রে বিশ্লেষণের সেই পদ্ধতিরই এক উন্নততর সংস্করণ। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন আয়নের অতি সূক্ষ্ম ভরের তুলনা করা সম্ভব হয়। এর সাহায্যেই অ্যাস্টন আইসোটোপ সম্পর্কিত নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ে সক্ষম হন।

'পজিটিভ-রে' নতুন কথা। তাই এর অর্থ জানা দরকার। নিম্নচাপে কোন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ ক্ষরণ ঘটালে কিছু কিছু গ্যাস-অণু পজিটিভ আধানযুক্ত হয়ে আয়নিত হয়। তার মানে তারা তাদের অণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন হারায়। এই রকম আয়নেরা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে ক্ষরণ নলের মধ্যে ক্যাথোডের বা নেগেটিভ তড়িৎদ্বারের দিকে অগ্রসর হয়।

ক্যাথোডের মধ্যে একটি ছিদ্র করলে ঐ আয়নেরা রশ্মির আকারে ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই রকম রশ্মিকেই পজিটিভ রশ্মি বা 'ক্যানাল রশ্মি' বলে।

এক গুচ্ছ পজিটিভ রশ্মি যখন কোন চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন ঐ রশ্মির অন্তর্গত বিভিন্ন আয়নগুলি বিভিন্ন পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়। আয়নের এই বিক্ষেপ নির্ভর করে আয়নের গতিবেগ, ভর ও আধানের উপর। তাদের এই বিক্ষেপ ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর তাদের ক্রিয়ার ফলে ধরা পড়ে।

যদি কোন পজিটিভ রশ্মিগুচ্ছে একই ভর কিন্তু বিভিন্ন গতিবেগযুক্ত বিভিন্ন আধান থাকে, তাহ'লে ফটোগ্রাফিক প্লেটের সংস্পর্শে এসে তারা প্যারাবোলার মতো দাগ রেখে যায় প্লেটের উপর। আর একটি পজিটিভ রশ্মিগুচ্ছ, যার অন্তর্গত আয়নগুলির ভর আলাদা, যদি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পড়ে, তবে তাদের দ্বারা সৃষ্ট প্যারাবোলা রেখার অবস্থান পূর্ববর্তী প্যারাবোলা রেখার অবস্থান থেকে একটু দূরে দেখা যায়। কাজেই প্যারাবোলা রেখার অবস্থান দেখে পজিটিভ রশ্মির অন্তর্গত আয়নের ভর জানা যায়। এইভাবে পজিটিভ রশ্মির অন্তর্গত কণার ভর নির্ধারণের পদ্ধতিকে বলা হয় 'পজিটিভ রশ্মি বিশ্লেষণের প্যারাবোলা পদ্ধতি'।

উইলিয়ম অ্যাস্টন নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্র 'মাস স্পেকটোগ্রাফ' এর সাহায্যে পজিটিভ রশ্মি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে অধিকাংশ মৌলই তার বিভিন্ন আইসোটোপের মিশ্রণ। তারমানে অধিকাংশ মৌলের মধ্যেই একাধিক পরমাণু আছে, যাদের পারমাণবিক গুরুত্ব সমান সমান, রাসায়নিক ধর্ম একই প্রকার, অথচ ভর-সংখ্যা বিভিন্ন। ক্লোরিনের পারমাণবিক গুরুত্ব 35,46, ক্লোরিনের দু' রকম ভর-সংখ্যা সম্পন্ন (35 এবং 37) আইসোটোপ আছে। নির্দিষ্ট অনুপাতে তারা মিশ্রিত থাকার জন্যেই ক্লোরিন অণুর গড় পারমাণবিক গুরুত্ব হয়েছে 35.46।

মাস স্পেকটোগ্রাফের সাহায্যে আইসোটোপ সংক্রান্ত অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ উইলিয়ম অ্যাস্টনকে 1922 সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ইংল্যাণ্ডের এই কৃতী রসায়ন বিজ্ঞানী 1945 সালে দেহত্যাগ করেন।



লিজে মাইটনার

(1878—1968)

1938 সালের কথা বলছি।

জার্মানদের ইহুদী বিদ্বেষ তখন চরমে উঠেছে।

অষ্ট্রিয়ান ইহুদী 'লিজে মাইটনার' তখন বার্লিনের 'কাইজার উইলহেল্‌ম ইনস্টিট্যুট' এর পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করছিলেন। জার্মানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হলো না এই প্রতিভাময়ী মহিলার। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর গ্রেপ্তার আসন্ন। আর

গ্রেপ্তার হলে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। এটা অনুমান করে লিজে মাইটনার রাতারাতি তাঁর জামা-কাপড় একটি স্যুটকেশে ভরে নিলেন এবং এক হপ্তার ছুটী কাটাবার নাম করে ট্রেনযোগে হল্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হলেন। কোনও ক্রমে একটি স্যুইডিশ ভিসা যোগাড় করে কুমারী মাইটনার স্যুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে পালিয়ে গেলেন হল্যাণ্ড থেকে। এই মহিলা বিজ্ঞানীর জার্মানী থেকে পশ্চিমী দেশে অন্তর্ধান, পশ্চিমী দেশগুলির পক্ষে শাপে বর হলো; কারণ এঁর পরবর্তী জীবনের গবেষণা এনরিকো ফার্মির পরমাণু সম্পর্কিত তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করলো। পরমাণু বোমা বানাবার তুরন্ত প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলো।

1878 সালে জন্ম লিজে মাইটনারের। তাঁর বাবা ছিলেন ভিয়েনিজ আইনজীবী, সংস্কৃতি সম্পন্ন পুরুষ। তাঁর বাড়ীতে ছিল সুন্দর একটি লাইব্রেরী। সেই লাইব্রেরীর যাবতীয় বই একটি একটি করে পড়ে ফেলতে লাগলেন কুমারী মাইটনার। তখন অল্প বয়েস। স্কুলের ছাত্রী। কতো বিষয়ের কতো রকমের বই-ই না পড়লেন লিজে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগলো তাঁর বিজ্ঞানের বইগুলি।

ছেলেবেলায় অনেকেই এক আধজন মানুষকে আদর্শ হিসাবে জীবনে গ্রহণ ক'রে সেই আদর্শ মানুষটির মতো হবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। লিজে মাইটনারের কাছে এমনি এক আদর্শ স্থানীয়া মানুষ ছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মেরী ক্যুরি। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার ও তাঁর অধীনে গবেষণা করার স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

লিজে মাইটনার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এর কাছে পড়াশুনা করবার উদ্দেশ্যে বার্লিনে যাবার অনুমতি চাইলেন পিতার কাছে। সে অনুমতি মিললো। বার্লিনে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কাছে অধ্যয়ন ক'রে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করলেন। তারপর সহকর্মী অটো হান্ এর সঙ্গে যুগ্মভাবে গবেষণা চালালেন প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে। এই গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হলো প্রটোঅ্যাকটিনিয়াম' নামক এক তেজস্ক্রিয় মৌলের। এরপর লিজে রেডিয়াম, থোরিয়াম এবং তাদের তেজস্ক্রিয় বিভাজনজাত পদার্থ নিয়ে গবেষণা চালালেন। বিটা রশ্মির প্রকৃতি এবং পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত পদাথ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা সমসাময়িক গবেষকদের প্রেরণা জোগালো।

1930 সালের পর বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের দৃষ্টি নিবন্ধ হলো ইউরেনিয়াম

মৌলটির উপর। 1934 সালে এনরিকো ফার্মি ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত হানলেন নিউট্রন কণার দ্বারা। এর ফলে জন্ম নিল এক নতুন মৌল, নাম তার 'নেপচুনিয়াম'। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন কর্তৃক আবিস্কৃত সংকেত $E = M.C^2$ তখন বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়েছে। অতি সামান্য ভর থেকে অসীম শক্তি আহরণের তাত্ত্বিক পথ দেখিয়েছে। পরমাণু বিভাজনের দ্বারাই অসীম শক্তি আহরণ করা সম্ভব, সেটা বিজ্ঞানীরা তখন বুঝতে পেরে চালিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। বার্লিনে লিজে মাইটনারও এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তাঁর কাজ। এক মুহূর্তও নষ্ট করবার মত সময় নেই। সহকর্মী 'অটো হান' এবং ফ্রেডারিক স্টাসম্যানের সহযোগিতায় লিজে মাইটনার উদ্ভাবন করলেন এক অতি সংবেদনশীল 'পারমাণবিক মাইক্রোসকোপ' যন্ত্র। এ যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম রাসায়নিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলো। এরপর ধীরগতি সম্পন্ন নিউট্রন কণার সাহায্যে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসকে আঘাত হেনে তাঁরা এক নতুন মৌল 'বেরিয়াম' এর সন্ধান পেলেন।

এই গবেষণা আরও চালিয়ে যাওয়া কিছুকাল বন্ধ রাখতে হলো, কারণ নাজি পুলিশ বাহিনী তখন লিজে মাইটনারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্রেপ্তার করার জন্যে। লিজে গোপনে পালিয়ে গেলেন স্টকহোমে। সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন কোপেনহেগেনে তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিশের কাছে। অটো ফ্রিশ তখন কোপেনহেগেনে বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর এর সঙ্গে গবেষণা করছিলেন। এদিকে হান ও স্ট্রাসম্যান লিজের অসমাপ্ত গবেষণা সম্পূর্ণ করতে লাগলেন এবং তার ফলাফল নিয়মিত জানাতে লাগলেন লিজেকে।

238 ভর বিশিষ্ট উইরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত হেনে ঐ দুই জার্মান বিজ্ঞানী বিভিন্ন পারমাণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন দুটি মৌলের সন্ধান পেলেন।—হ্যাঁ, ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজিত হলো সত্যি, কিন্তু এক্ষেত্রে হান ও স্ট্র্যাসমান এই বিভাজনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঠিকমতো দিতে পারলেন না। তখন কুমারী লিজে মাইটনার আবার শুরু করলেন ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পরীক্ষায় লিজে দেখলেন যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে বেরিয়াম ও ক্রিপটন মৌলের দু'টি নিউক্লিয়াস এবং এই সময় মুক্তি পেয়েছে প্রচণ্ড শক্তি,—প্রায় দু' হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট তড়িৎ শক্তির সমতুল্য শক্তি। ইউরেনিয়াম পরমাণুর কিছুটা ভর আইনস্টাইনের $E=m.c^2$ সমীকরণ অনুযায়ী শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

1939 সালে লিজে মাইটনার বৃটিশ বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ এই পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশ করলেন। নিউট্রন কণা দ্বারা ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত হেনে শক্তির উদ্ভব ঘটানোর এই প্রক্রিয়ার নাম দিলেন তিনি 'ফিসন'। এই প্রবন্ধ পড়া মাত্রই বিখ্যাত ড্যানিশ পদার্থ বিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোর ছুটে গেলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও এনরিকো ফার্মির সঙ্গে পরামর্শ করতে। আমেরিকার তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে লিজে মাইটনারের গবেষণার বিষয়বস্তু ও ফলাফল সম্পর্কে জানানো হলো। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আদেশে আমেরিকায় পরমাণু বোমা তৈরির জন্যে 'মানহাট্টান প্রজেক্ট' গড়ে উঠলো। অচিরেই সেখানে 'অ্যাটম বোমা' বানানো হলো। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটির উপর যখন সেই অ্যাটম বোমা ফেলা হলো তখন মানুষ জানতে পারল —এই বোমা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী লিজে মাইটনারের অবদান কতখানি। লিজে মাইটনার, এমন এক মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুতির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত হওয়ায় দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'অ্যাটম বোমা' প্রস্তুতির মধ্যে দিয়েই হয়তো ভবিষ্যতে বিশ্বে ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধের সূচনা ঘটবে এবং মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েই মানুষ হয়তো অ্যাটম বোমার মত মারাত্মক অস্ত্র তৈরির মত পাপ কাজের প্রায়শ্চিত্ত করবে একদিন।



আরভিং ল্যাঙ্গমুর
(1881—1957)

আজ থেকে একশো বছর আগে নিউইয়র্ক এর ব্রুকলিনে আরভিং ল্যাঙ্গমুর জন্মগ্রহণ করেন। এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ল্যাঙ্গমুর ব্রুকলিনের পাবলিক স্কুলে পড়াশুনা করেন। এই সময় বড় ভাই আর্থার এর কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন ল্যাঙ্গমুর। আর্থারের উৎসাহে ও সাহায্যে মাত্র ন' বছর বয়সে একটি ছোট্ট ওয়ার্কশপ এবং বারো বছর বয়সে একটি ক্ষুদে বিজ্ঞান পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

এগারো থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আরভিং প্যারি নগরীর একটি বোর্ডিং

স্কুলে পড়াশুনা করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উপলক্ষে ঐ সময় তাঁকে নিউইয়র্ক ছেড়ে সপরিবারে ফরাসী দেশে গিয়ে বসবাস করতে হয়েছিল। প্যারি নগরীর এই আবাসিক স্কুলটি খুব ভাল লেগেছিল আরভিং-এর, কারণ এখানকার পরীক্ষাগারে তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেতেন।

ফরাসী দেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে আরভিং-এর পিতা ফের চলে আসেন স্বদেশে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে এসে ছেলেকে প্রথমে তিনি ভর্তি করেন ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলে এবং পরে ব্রুকলিনের 'প্রাট ইনস্টিট্যুটে।' এই 'প্রাট ইনস্টিট্যুটে' আরভিং-এর দাদা 'আর্থার' তখন প্রশিক্ষক ও শিল্প রসায়নবিদের কাজ করতেন। রসায়নশাস্ত্রবিদ্ দাদার সংস্পর্শে থেকে এই সময় আরভিং রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পূর্ণোদ্যমে এই বিষয়ের জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হন। অনন্য সাধারণ মেধার অধিকারী আরভিং এই সময় মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে 'ক্যালকুলাস' শিখে ফেলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক নানান্ পত্র-পত্রিকা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন।

1899 সাল।

স্কুলের পাঠ শেষ করে আরভিং ভর্তি হন কলম্বিয়ার 'স্কুল অফ মাইন্স'-এ। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধাতু প্রযুক্তি বিজ্ঞানের স্নাতক শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন। কৃতিত্বের সঙ্গে এখানকার পাঠ সাঙ্গ করে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে আরভিং চলে যান জার্মানীতে সেখানকার গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়াশুনা করেন।

জার্মানী থেকে পাঠ সমাপনান্তে আরভিং যখন দেশে ফিরে এলেন তখন দেশের খ্যাতনামা অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর কাছে প্রস্তাব এলো চাকরিতে যোগ দেবার জন্যে। আরভিং ল্যাঙ্গমুর চেয়েছিলেন সত্যিকারের বিজ্ঞানী হতে।—চাকরি করে গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাতে তিনি চান নি। স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তাই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। নিউ জার্সির 'স্টিভেনসন টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট।' এইখানেই শুরু করলেন তাঁর কর্মজীবন—অধ্যাপনা ও সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

1909 সালের গ্রীষ্মকাল।

বিখ্যাত জেনারেল ইলেট্রিক কোম্পানী নিউ-ইয়র্কে তাঁদের নতুন একটি গবেষণাগার সবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আরভিং ল্যাঙ্গমুরকে

আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে। প্রতিশ্রুতি দিলেন—কোম্পানীর কাজ ক'রে অবসর সময়ে তাঁকে ইচ্ছামতো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার সুযোগ দেওয়া হবে। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর ঐ গবেষণাগারের অধিকর্তা তখন 'উইলিস আর হুইটনি'। তাঁর এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন ল্যাঙ্গমুর। কলেজ ছেড়ে চলে এলেন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণাগারে, তাঁর দ্বিতীয় কর্মস্থলে।

ঐ গবেষণাগারে যে সব গবেষক তখন কাজ করছিলেন, তাঁদের ধারণা ছিল যে বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে যে সব অপদ্রব্য থাকে, সেগুলি জ্বলন্ত টাংস্টেন তারের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিলামেন্টের তারকে দুর্বল করে দেয়। ফলে টাংস্টেনের ফিলামেন্টটি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়, বাল্ব অকেজো হয়ে পড়ে। তাঁরা ভাবতেন যে বাল্বের ভেতরটা আরও ভালভাবে বায়ুশূন্য করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হয়তো হতে পারে। টাংস্টেনের ফিলামেন্টযুক্ত বাল্বগুলির পরমায়ু বাড়াবার একটা সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবনের ভার দেওয়া হলো আরভিং ল্যাঙ্গমুরকে।

ল্যাঙ্গমুর বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরকার বায়ু দ্রুত ও সুন্দরভাবে বের করে দেবার জন্যে এক বিশেষ ধরনের 'মার্কারি ভেপার পাম্প' তৈরি ক'রে ফেললেন। তারপর বাল্বের টাংস্টেন ফিলামেন্টের পরমায়ু বাড়াবার জন্যে নিজস্ব চিন্তাধারার.উপর ভিত্তি করে তিনি একটা নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। কিন্তু কি সেই তত্ত্ব ?—বলছি সে কথা।

ল্যাঙ্গমুর পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে আর্গন, নাইট্রোজেন ও এমনি আরও কয়েকটি গ্যাস উত্তপ্ত টাংস্টেন তারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। অতএব এই রকম কোন গ্যাসকে বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে পরিমিত পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে দিলে হয়তো টাংস্টেন তারের ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হবে।—হলোও তাই। ল্যাঙ্গমুরের এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে টাংস্টেন ফিলামেন্টযুক্ত উন্নত মানের বৈদ্যুতিক বাল্ব প্রস্তুত করা সম্ভব হলো। দীর্ঘকালের এক সমস্যারও স্থায়ী সমাধান ঘটলো।

এই গবেষণাটি চালাবার সময় ল্যাঙ্গমুর লক্ষ্য করেছিলেন যে অতি উত্তপ্ত টাংস্টেন তারের উষ্ণতার সংস্পর্শে হাইড্রোজেন অণু এলে, তা হাইড্রোজেন পরমাণুতে বিভাজিত হয়ে যায়। তারপর সেই পরমাণুগুলির পুনর্মিলনের সময় প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর ক'রে 1927 সালে 'পারমাণবিক হাইড্রোজেন টর্চ' আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। প্রায় সাত হাজার

ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতায় ধাতুকে গলিয়ে জোড়া লাগাবার (ওয়েল্ডিং করার) কাজ করা সম্ভব হয় এই বিশেষ ধরনের টর্চের সাহায্যে।

ল্যাঙ্গমুরকে প্রযুক্তিবিদ্ আখ্যা দিলে কিন্তু ভুল করা হবে। তিনি ছিলেন আরও বড়। বিজ্ঞানী হিসাবেও তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তখনকার দিনের রসায়ন বিজ্ঞানীরা একটা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছিলেন। ফ্লোরিন, ক্লোরিন প্রভৃতি মৌলগুলির রাসায়নিক সক্রিয়তা খুব বেশী। তারমানে এই সব মৌল অন্যান্য মৌলের সঙ্গে সহজেই বিক্রিয়া ঘটাতে পারে; অথচ আর্গন, হিলিয়াম প্রভৃতি মৌলগুলি তা পারে না।—বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক ক্রিয়াশীলতায় কেন এই পার্থক্য? সেকালের রসায়ন শাস্ত্রবিদেরা এর সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ল্যাঙ্গমুর কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে পরমাণুর গঠন প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে।

সে যুগের অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীই পরমাণুর গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন। তাঁদের গবেষণার ফলে জানা গিয়েছিল যে প্রত্যেক পরমাণুরই একটি কেন্দ্রীন্ বা নিউক্লয়াস আছে। এই নিউক্লয়াসকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রনেরা। পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে এই তত্ত্ব ল্যাঙ্গমুরও জানতেন। পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত ও রসায়ন—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের এই তিন শাখাতেই প্রগাঢ় জ্ঞান থাকার জন্যে ল্যাঙ্গমুর মৌলের রাসায়নিক ক্রিয়াশীলতার কারণটা সহজেই অনুমান করতে পারলেন।

হাইড্রোজেনের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক এক (1)। এই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে নিকটবর্তী কক্ষে অর্থাৎ প্রথম কক্ষে সর্বাধিক দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে। কিন্তু সে জায়গায় হাইড্রোজেন পরমাণুর আছে একটি ইলেকট্রন। সুস্থিত পারমাণবিক গঠন পেতে হলে হাইড্রোজেন পরমাণুটির ঐ সবেধন নীলমণি ইলেকট্রনটিকে হয় ছেড়ে দিতে হবে, নতুবা আর একটি ইলেকট্রন অন্য কোন পরমাণুর কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে নিজের সবচেয়ে বাইরের কক্ষে 2টি ইলেকট্রন রাখার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। অপরপক্ষে—হিলিয়াম পরমাণুর গঠন পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে এই মৌলটির পরমাণু ক্রমাঙ্ক দুই (2)। এর নিউক্লিয়াসের বাইরে একটি মাত্র কক্ষ আছে এবং সেই কক্ষে প্রদক্ষিণ করছে 2টি ইলেকট্রন। বহিঃস্তম কক্ষে 2টি ইলেকট্রন থাকায় হিলিয়াম পরমাণু সুস্থিত গঠনের অধিকারী এবং সেই জন্যে নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তার রাসায়নিক সক্রিয়তা নেই।

আবার 'নিয়ন' নামক মৌলটির পরমাণু ক্রমাঙ্ক যে 10 (দশ), তা ল্যাঙ্গমুর

নিজেই নির্ণয় করেন। নিয়ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে নিকটবর্তী (প্রথম) কক্ষে 2টি ইলেকট্রন আছে ঘূর্ণনরত অবস্থায়। এর দ্বিতীয় বা বহিঃস্তম কক্ষে ঘূর্ণনরত অবস্থায় আটটি ইলেকট্রন আছে।—প্রথম কক্ষে 2টি ইলেকট্রন থাকলে পরমাণু যেমন সুস্থিত হয় (হিলিয়ামের ক্ষেত্রে), তেমনি সবচেয়ে বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রন থাকলেও পরমাণু সুস্থিত হয়। নিয়ন পরমাণুও তাই সুস্থিত, অর্থাৎ হিলিয়ামের মতো তারও রাসায়নিক সক্রিয়তা নেই। ফ্লোরিনের বেলায় কিন্তু অন্যরকম ব্যাপার ঘটে। ফ্লোরিনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 9 (নয়)। এর নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের অর্থাৎ প্রথম কক্ষে আছে 2টি ইলেকট্রন। পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং বহিঃস্তম কক্ষে আছে বাকি 7টি ইলেকট্রন। অষ্টকপূর্তির জন্যে তার বহিঃস্তম কক্ষের প্রয়োজন একটি মাত্র ইলেকট্রন। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কাছ থেকে একটি ইলেকট্রন পেলেই ফ্লোরিন পরমাণুর এই অষ্টকপূর্তির সাধ মেটে। সেই কারণে ফ্লোরিন পরমাণু খুবই সক্রিয়। সে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে 'হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড' নামক যৌগ গঠন করতে পারে। এই যৌগ গঠনের সময় হাইড্রোজেন পরমাণু কর্তৃক বর্জিত ইলেকট্রনটি গ্রহণ ক'রে ফ্লোরিন পরমাণু তার বহিঃস্তম কক্ষে আটটি ইলেকট্রন নিয়ে সুস্থিত গঠন লাভ করে।

মৌলের রাসায়নিক সক্রিয়তার এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি লাভ করে। শুধু তাই নয়। তিনি 'আইসোটোপ' সৃষ্টির কারণও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে বাইরের কক্ষে যদি সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে কিন্তু ঐ পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াসের গঠনে নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য হয়, তবেই উৎপত্তি হয় আইসোটোপের।—এ তত্ত্বও বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি পায়। মৌলের রাসায়নিক ক্রিয়াশীলতার কারণ ও 'আইসোটোপ' উৎপত্তির কারণ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাঙ্গমুর 1932 সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁকে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণা বিভাগের উপপ্রধানের পদে উন্নীত করা হয়। সেই পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন 1951 সালে। আর তার ছ' বছর বাদেই নিজের নামকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর ক'রে রেখে তিনি চিরবিদায় নেন্ এই সুন্দর পৃথিবী থেকে।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র
(1890—1963)

ভারতের মুষ্টিমেয় যে ক'জন বিজ্ঞানী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিজ্ঞান সাধনা ক'রে গেছেন, গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, মাতৃভূমিতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারের জন্যে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করেছেন এবং কৃতী বিজ্ঞানী ছাত্রগোষ্ঠী রেখে গেছেন, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতে বেতার-বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

1890 খ্রীস্টাব্দের 24শে অক্টোবর তারিখে কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়কৃষ্ণ মিত্র, মাতার নাম শরৎকুমারী দেবী। শরৎকুমারী ছিলেন চিকিৎসক। ভাগলপুরের লেডি ডাফরিন হাসপাতালে তিনি কার্যভার গ্রহণ করায় জয়কৃষ্ণ সপরিবারে ভাগলপুরে চলে যান এবং সেইখানেই বাড়ী তৈরি ক'র বসবাস করতে থাকেন।

ভাগলপুর থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ ক'রে শিশিরকুমার সেখানকার টি. এন. জে. কলেজে এফ এ. ক্লাশে ভর্তি হন। এফ. এ. পাশ ক'রে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সেখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ঐ কলেজ থেকেই তিনি বি. এস. সি. এবং এম. এস. সি: পাশ করেন। 1912 সালে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে শিশিরকুমার অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন।

আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ এম. এস. সি. পাশ করার পরই শিশিরকুমারকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। প্রথমে তিনি ভাগলপুরের টি.এন.জে. কলেজে ও পরে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বেশীদিন শিশিরকুমারকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয় নি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের কয়েকজন কৃতী পদার্থ-বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানান্ স্যার আশুতোষ। আমন্ত্রিত সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে শিশিরকুমার ছিলেন অন্যতম।

1916 সালে শিশিরকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন গবেষণাও। তখন ঐ কলেজে পদার্থবিদ্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। অধ্যাপক রামনের অধীনে Interference and diffraction of light সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে শিশিরকুমার 1919 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর যান বিদেশে। প্যারিসে সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফ্যাব্রির অধীনে আলোক তরঙ্গ বিষয়ে গবেষণা ক'রে শিশিরকুমার সেখানকার ডি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন। কয়েকমাস মাদাম ক্যুরীর অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্যও হয় তাঁর। ইলেকট্রন টিউব বা রেডিও ভাল্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার এরপর চলে যান ন্যানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিট্যুট অফ ফিজিক্সে। সেখানে অধ্যাপক গুতনের কাছে কিছুকাল গবেষণা ক'রে তিনি বেতার-বিজ্ঞানের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা উপলব্ধি করেন।

1923 খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে ডক্টর মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে বেতার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় লিপ্ত হন। বিজ্ঞান কলেজে 2CZ নামে এক বেতার প্রেরক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বেতার কেন্দ্র থেকে তখনকার দিনে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা ও গান-বাজনার অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বেতার-বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার প্রবর্তন করেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র।

1942 সালে Council of Scientific and Industrial Research-এর অধীনে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Radio Research Board.' বলা বাহুল্য, সেই বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন অধ্যাপক মিত্র। 1949 সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে তাঁর অক্ষয় কীর্তি "Institute of Radio Physics and Electronics." 1955 সালে C. S. I. R-এর অর্থ সাহায্যে অধ্যাপক মিত্র হরিণঘাটায় গড়ে তোলেন Ionosphere Field Station. ঐ বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং C. S. I. R. কর্তৃপক্ষ তাঁকে হরিণঘাটার Ionosphere Field Station-এর অধিকর্তার পদে নিয়োগ ক'রে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।

শিশিরকুমার উর্ধাকাশের আবহমণ্ডল, বিশেষ ক'রে আয়নমণ্ডল সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে। আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের শোষণ সম্পর্কে তাঁর পরিচালনায় যে সব গবেষণা হয়, বিজ্ঞান জগতে তা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিজের ল্যাবরেটরীতে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখান,—কি ভাবে বেতার তরঙ্গ উর্ধাকাশের আয়নযুক্ত স্তর বা আয়নোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

উর্ধাকাশের আবহমণ্ডল সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে শিশিরকুমার নতুন যে সব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইংরেজীতে লেখা ঐ গ্রন্থখানির নাম "আপার অ্যাটমস্‌ফিয়ার।" 1947 সালে ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, রুশ ভাষাতেও অনুদিত হয়। গ্রন্থখানি সারা বিশ্বের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ঐ গ্রন্থখানির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1952 সালে। আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ শিশিরকুমার 1958 সালে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

1932—33 সালে আন্তর্জাতিক মেরু বছরের কাজ শুরু হয়। সেই সময় আয়নমণ্ডল ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষণার কাজ চালানো হয়। ইউরোপের অনেক দেশ এতে অংশ গ্রহণ করে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষই এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করে, অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর শিষ্যবর্গের সক্রিয় প্রতিনিধিত্বে।

অধ্যাপক জীবন শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই শিশিরকুমার পেয়েছিলেন একদল কৃতী শিষ্য। এঁদের মধ্যে ডঃ হৃষীকেষ রক্ষিত, ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, ডঃ সুধাংশু দেব, ডঃ অশেষ মিত্র ও ডঃ অরুণ সাহা অন্যতম। ডঃ সুধাংশু দেবের সহযোগিতায় অধ্যাপক মিত্র ডিসচার্জ টিউব বা ক্ষরণ নল এর ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও বিক্ষেপের উপর আলোকের প্রভাব নিয়ে যে সব নিবন্ধ প্রকাশ করেন, তা তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে অতি মূল্যবান বলে পরিগণিত হয়। মেঘমুক্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির আকাশ থেকে যে ক্ষীণ আলোর ধারা পৃথিবীতে এসে পড়ে তার উৎপত্তির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় ব্রতী হয়ে অধ্যাপক মিত্র বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন।

1943 সালে অধ্যাপক মিত্র Active Nitrogen বা সক্রিয় নাইট্রোজেনের উপর গবেষণা শুরু করেন। সক্রিয় নাইট্রোজেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই

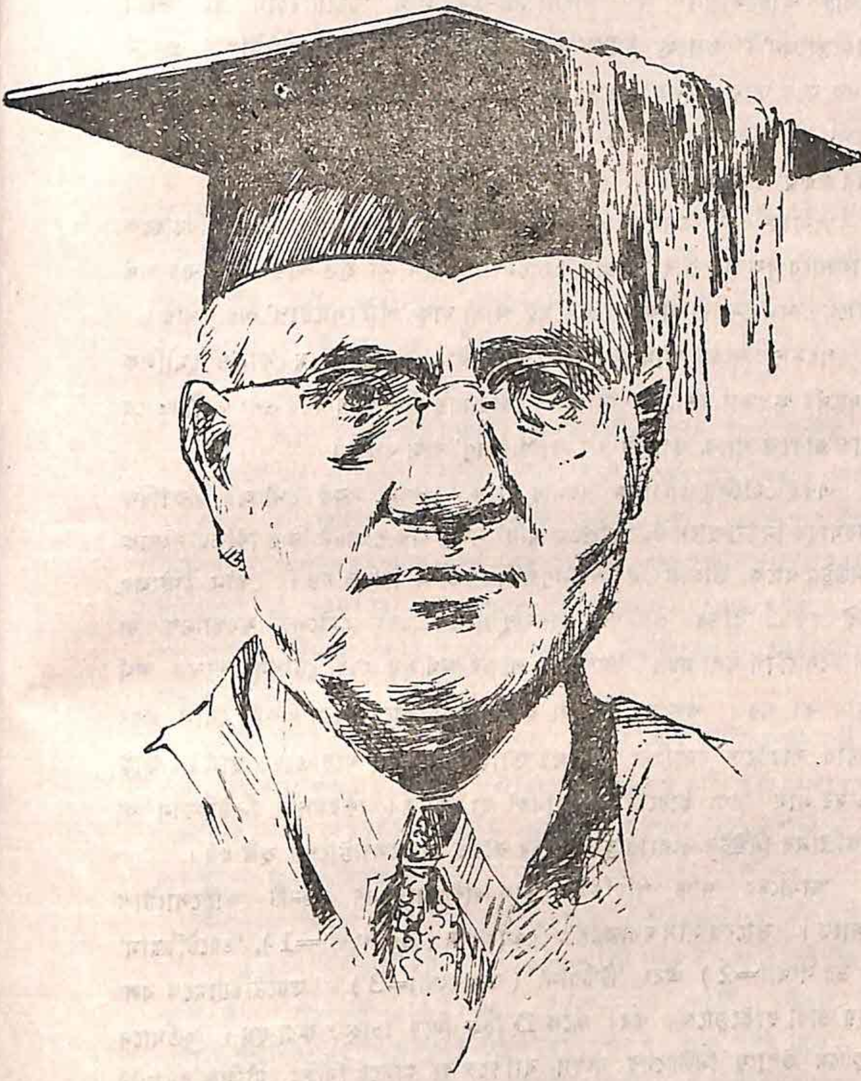
যে, বৈদ্যুতিক উত্তেজনার আধার ভোল্টেজ তুলে নিলেও এটি অনেকক্ষণ ধরে আলো বিকিরণ করতে থাকে। গবেষণান্তে "Active Nitrogen—a new theory" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন শিশিরকুমার।

1949 সালে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক আয়নোস্ফিয়ার কনফারেন্সে শিশিরকুমার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্বের বেতার বিজ্ঞান সংস্থার সিডনী অধিবেশনে (1952 সালে) এবং 1954 সালের হেগ্‌ অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসাবে যোগদান করেন।

1962 সালে অধ্যাপক মিত্রকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এ ভিন্ন সারা জীবনে অধ্যাপক মিত্র অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তারমধ্যে রাজা পঞ্চম জর্জ সিলভার জুবিলী মেডেল, এশিয়াটিক সোসাইটির সায়েন্স কংগ্রেস মেডেল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মেডেল অন্যতম।

অধ্যাপক মিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর দূর দৃষ্টি, কর্তব্য নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও নিয়মানুবর্তিতা। চলাফেরা, কথাবার্তা, বেশভূষা ও আচার ব্যবহারেও ছিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য।

1963 সালের 13ই আগষ্ট তারিখে বাংলা তথা ভারতের এই কৃতী বিজ্ঞানীর কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।



হ্যারল্ড ইউরে

(1893—1981)

1934 সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এক আমেরিকান বিজ্ঞানী নাম 'হ্যারল্ড ,ইউরে'। যে আবিষ্কারের জন্যে ইউরে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পেয়েছিলেন, সেটি হলো ভারী জল। হাইড্রোজেনের

একটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক-এর নাম 'ডয়টেরিয়াম' বা 'ভারী হাইড্রোজেন'। হ্যারল্ড ইউরে হাইড্রোজেনের এই আইসোটোপটি প্রথমে পৃথক করে তার থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন ভারী জল—রসায়নের ভাষায় যা হলো ডয়টেরিয়াম অক্সাইড (D_2O) এবং পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর জীবন কাহিনী শোনাবার আগে তাঁর আবিষ্কারকে ভালভাবে বুঝবার সুবিধার জন্যে রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের অর্থ আগে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই আসা যাক্ 'আইসোটোপ' এর কথায়।

পরমাণুর সংজ্ঞা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। যে কোনও মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং স্বাধীনভাবে নাও থাকতে পারে, তাকেই আমরা 'পরমাণু' বলে থাকি।

একই মৌলের একাধিক পরমাণু থাকে। এখন একই মৌলের একাধিক পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রিনে যদি সমসংখ্যক প্রোটন কিন্তু বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকে, তাহলে ঐ পরমাণুগুলির ওজন বিভিন্ন হয়। কোন মৌলের এই রকম বিভিন্ন ওজনযুক্ত পরমাণুগুলিকে সেই মৌলের সমস্থানিক বা আইসোটোপ বলা হয়। 'আইসো' শব্দের অর্থ সম এবং 'টোপস্' শব্দের অর্থ স্থান বা ঘর। ওজনে আলাদা হলেও আইসোটোপেরা একই মৌল এবং পর্যায় সারণীতে মৌলিক পদার্থের তালিকায় একই ঘরে এদের স্থান। তাই এদের নাম রাখা হয়েছে 'সমস্থানিক' বা সমঘর। পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিনের নিউট্রন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয়।

আমাদের অতি পরিচিত মৌল হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ আছে। তাদের নাম যথাক্রমে: প্রোটিয়াম (ভর সংখ্যা=1), 'ডয়টেরিয়াম' (ভর সংখ্যা=2) এবং 'ট্রিটিয়াম' (ভর সংখ্যা=3)। ডয়টেরিয়ামকে বলা হয় ভারী হাইড্রোজেন এবং একে D চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে নিউট্রনের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বহু নতুন নতুন কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

একটু আগেই 'ভরসংখ্যা' নামে একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এই শব্দটির অর্থ জেনে রাখা দরকার। কোন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রস্থ প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টিকে ঐ পরমাণুর 'ভর-সংখ্যা' বলা হয়।

অ্যাসিড অথবা ক্ষারের লঘু জলীয় দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে জলের সবচেয়ে হাল্কা আইসোটোপ 'প্রোটিয়াম' উৎপন্ন হয়। তার ফলে ঐ জলের

অবশিষ্টাংশে ডয়টেরিয়াম বা ভারী হাইড্রোজেনের (D) অনুপাত বেড়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে যদি এই রকম জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ ক্রিয়া চালানো যায়, তবে সবশেষে যে জল অবশিষ্ট থাকে তার ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে 1.1 গ্রাম। এ হেন জলে হাইড্রোজেনের ডয়টেরিয়াম আইসোটোপটিই থাকে। অপর আইসোটোপ দু'টি (প্রোটিয়াম ও ট্রিটিয়াম) মোটেই থাকে না।—এই জলই ভারী জল। এর স্ফুটনাংক 101.4 ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং হিমাংক 3.8 ডিগ্রী সেলসিয়াস। সাধারণ জলের চাইতে ভারী জল বেশি আঠালো। 'অ্যাটমিক পাইল' নামক যন্ত্রে ভারী জলকে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকসনের তীব্রতা, (অর্থাৎ দ্রুতগামী নিউট্রনের গতি) মন্দীভূত করার কাজে মডারেটার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এবারে আসা যাক্ কৃতী বিজ্ঞানী হ্যারল্ড ইউরের জীবন কাহিনীতে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত 'ওয়ালকারটন' শহরে হ্যারল্ডের জন্ম হয়। জন্ম তারিখ—25-শে এপ্রিল, 1893 সাল। এঁর বাবা ছিলেন ধর্মযাজক। হ্যারল্ডের বয়স যখন মাত্র ছ' বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। হ্যারণ্ডের মা আর এক ধর্মযাজককে বিয়ে করেন। এতে অবশ্য হ্যারল্ডের পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি সৃষ্টি হয় নি, বিঘ্নিত হয় নি তাঁর লেখা-পড়াও।

স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে হ্যারল্ড তাঁর বাড়ির কাছাকাছি একটি স্কুলে তিন বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর মণ্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়ে সেখান থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক হন 1917 সালে। স্নাতক স্তরে তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে প্রাণিবিদ্যা ছিল অন্যতম।

বিজ্ঞানের স্নাতক হবার পর আবার একটা চাকরিতে যোগ দেন হ্যারল্ড। না, এবার আর শিক্ষকতা নয়। এবার তিনি এক শিল্প সংস্থায় রসায়নবিদ্রূপে কাজ করেন একনাগাড়ে দু' বছর। তারপর সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মণ্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন খুব অল্পকালের জন্যে। এই সময় আরও জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখান ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণার জন্যে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হ্যারল্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব সুন্দরভাবে আয়ত্ব ক'রে ফেলেন। এখানে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী গিলবার্ট লুইস এবং নীল্‌স বোর-এর কাছে পাঠগ্রহণ ছাড়াও এঁদের অধীনে গবেষণা ক'রে বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের সুযোগ পান। বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ

ডিগ্রী লাভ ক'রে হ্যারল্ড প্রথমে 'জন হপকিন্স' ও পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগ দেন। কাজ—অধ্যাপনা ও সেই সঙ্গে গবেষণা।

1931 সালে ডক্টর ইউরে স্পেকটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ক'রে হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালীতে কিছু অনিয়মিত আলোক রেখার (বিলেখের) সন্ধান পান। তখনই তাঁর সন্দেহ হয় যে, এটা নিশ্চয়ই কোন নতুন মৌলের উপস্থিতির জন্যে ঘটছে। এই সন্দেহের বশে তিনি পরীক্ষাধীন কিছুটা হাইড্রোজেন গ্যাসকে (– 250 ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও কিছু নিম্ন উষ্ণতায়) অতি শীতল ক'রে তরলে পরিণত করেন।

তারপর ঐ তরল হাইড্রোজেনকে সাবধানে ফুটিয়ে হাইড্রোজেনের একটি ভারী আইসোটোপ ডয়টেরিয়ামকে অপর আইসোটোপ প্রোটিয়াম থেকে পৃথক করতে সক্ষম হন। তিনি এও প্রমাণ করেন যে, ডয়টেরিয়ামে একটি প্রোটন, একটি নিউট্রন এবং একটি ইলেকট্রন বর্ত্তমান। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত, ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত এবং নিউট্রন নিস্তড়িৎ কণা।

এরপর ডক্টর ইউরে 'ভারী জল' প্রস্তুত ক'রে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলকে তাক্ লাগিয়ে দেন এবং এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটিও লাভ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডক্টর ইউরে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ U^{238} থেকে ঐ মৌলেরই অপর আইসোটোপ U^{235}-কে পৃথক করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুবই কাজে লাগে। ডক্টর ইউরেকে তখন আমেরিকার পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের উপদেষ্টামণ্ডলীতে গ্রহণ করা হয়। তিনি সে সময় বিভিন্ন মৌলের আইসোটোপগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানী হিসাবে হ্যারল্ড ইউরের এই অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের মূলে ছিল তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস কঠোর শ্রম আর কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা। ডক্টর ইউরে আজ নেই। 1981 সালের 5ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ আগামী দিনের বিজ্ঞানীদের কাছে অণুপ্রেরণার উৎস হ'য়ে রইবে চিরকাল।



পিটার লিওনিদোভিচ কাপিতজা

(1894—1984)

1978 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে-ছিলেন যে তিন পদার্থবিজ্ঞানী, 'পিটার লিওনিদোভিচ কাপিতজা' তাঁদের অন্যতম। 'লো-টেম্পারেচার ফিজিক্স' অর্থাৎ 'নিম্ন-উষ্ণতা পদার্থ-বিজ্ঞান'-এ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে সুইডিশ নোবেল কমিটি তাঁকে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিনগ্রাডের কাছে 'ক্রনস্ট্যাড' নামে এক ছোট্ট শহরে 1894 সালের জুলাই মাসের আট তারিখে কাপিতজার জন্ম হয়। তাঁর বাবা ও ঠাকুর্দা—উভয়েই সোভিয়েত রাশিয়ার 'জার'-এর আমলের সেনা-বাহিনীর অধ্যক্ষ বা জেনারেল ছিলেন। আর মা ;—তিনি ও ছিলেন এক জেনারেল-এর কন্যা। কাজেই সামরিক আদব কায়দা জানা পারিবারিক পরিবেশে পিটার কাপিতজা মানুষ হন। ছেলেবেলায় ইংরেজি জানা এক শিক্ষিকার কাছে পড়াশুনা করার ফলে কাপিতজা ইংরেজী ভাষা মোটামুটি ভালই শিখে ফেলেছিলেন। ইংরেজি ভাষা পড়তে, লিখতে এবং ঐ ভাষায়

কথা কইতে পারতেন। পরবর্তী জীবনে ইংল্যাণ্ডে বসবাসকালে ইংরেজী ভাষার এই জ্ঞান তাঁর খুব কাজে এসেছিল।

স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হন কাপিতজা। পেট্রোগ্রাড পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটে তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েন। সেখান থেকে স্নাতক হ'য়ে বেরিয়ে সেইখানেই তিনি অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। তখনকার দিনের খ্যাতনামা রুশবিজ্ঞানী আব্রাম আইঅফ ও সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির পরামর্শে 1921 সালে 27 বছর বয়সে কাপিতজা পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্যে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড তখন কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরির প্রধান। তাঁর অধীনে তখন তিরিশজন গবেষক-ছাত্র কাজ করছিলেন। এমন সময় সেখানে এলেন কাপিতজা। তিনি রাদারফোর্ডের ছাত্র হবার বাসনা প্রকাশ করলেন। পাকা জহুরী ছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। কাপিতজার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই রুশ যুবকটির মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। রাদারফোর্ড তাই তাঁকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছে গবেষণা ক'রে কাপিতজা পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করলেন।

1924 সালে কাপিতজাকে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরির চৌম্বক গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালকের পদে নিয়োগ করা হলো। কাপিতজা এখানে অতি শক্তিশালী চুম্বক তৈরি ক'রে কারিগরি ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর মর্যাদা অর্জন করলেন। তারপর গবেষণা ক'রে দেখতে লাগলেন—বিভিন্ন পদার্থকে অতি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে তাদের কি অবস্থা হয়। এই গবেষণার ফলেই তিনি আবিষ্কার করলেন একটি সূত্র—যার নাম 'কাপিতজার লিনিয়ার ল' (Kapitza's linear law)। তিনি দেখলেন যে ধাতব পদার্থের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করলে তড়িৎ প্রবাহের পথে ধাতু যে বাধা দেয় বা রোধ সৃষ্টি করে, তা ঐ ধাতুর চারপাশের চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। চৌম্বক-ক্ষেত্র যত শক্তিশালী হয়, ধাতু তড়িৎ প্রবাহের পথে তত বাধা সৃষ্টি ক'রে। এরপর কাপিতজা যখন লক্ষ্য করলেন যে ধাতুর এই বিশেষ ধর্মটি শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতার নীচেই বেশীরকমভাবে পরিলক্ষিত হয়, তখনই তিনি গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন নিম্ন-উষ্ণতার পদার্থবিজ্ঞানের দিকে।

নিম্ন-উষ্ণতার পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শীঘ্রই কাপিতজা এক অভিনব আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে, তরল হিলিয়ামকে $-271°$ সেলসিয়াস (শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে 271 ডিগ্রী নিচে) উষ্ণতায় শীতল করলে তরল

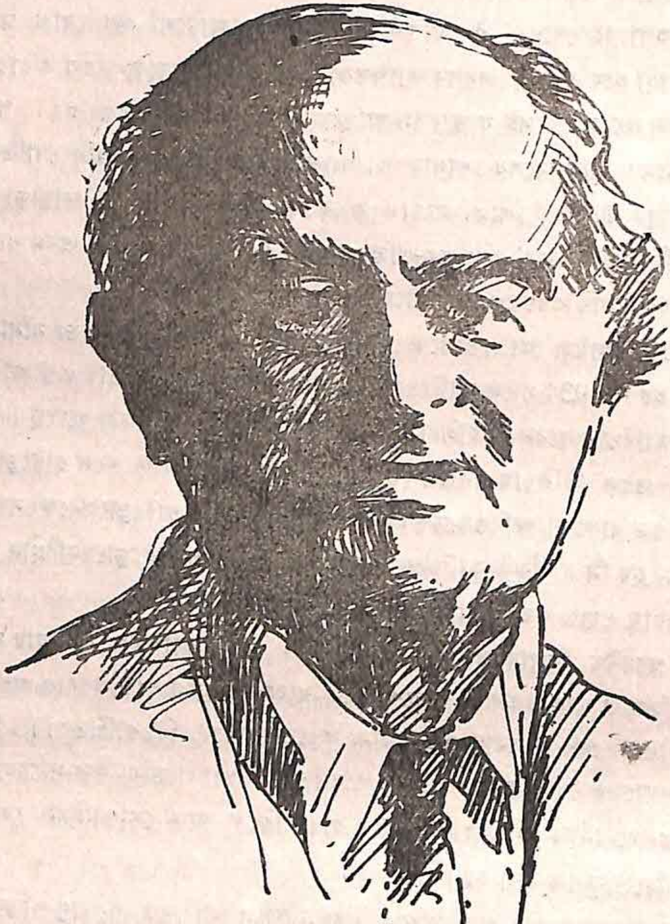
হিলিয়ামের মধ্যে এক অভাবনীয় ধর্ম দেখা যায়। তখন শ্রেষ্ঠ তাপ-পরিবাহী ধাতু কপারের চেয়েও ঐ অতিশীতল হিলিয়াম আটশো গুণ বেশি তাপ-পরিবাহী হয়ে ওঠে। এরপর কাপিতজা কম খরচে বায়ুকে তরল করার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। সেই যন্ত্রে তরল অক্সিজেন উৎপাদন করাও সম্ভব হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় কাপিতজার গবেষণালব্ধ ফলগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার ইস্পাত শিল্পে প্রয়োগ ক'রে সুফল পাওয়া যায়। তাছাড়া 'লো এনার্জি কমপিউটার' এবং স্বল্প-শক্তিতে চলে ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন ধরনের যন্ত্রগণক তৈরি করতেও বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

1929 সালে কাপিতজাকে ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়। 1934 সালে কাপিতজা হিলিয়াম গ্যাসকে তরল করার এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেন। হিলিয়াম গ্যাসকে-এর আগেও তরল করা হয়েছে। কিন্তু সেই তরল হিলিয়াম বিশুদ্ধ ছিল না। তাতে যৎসামান্য তরল হাইড্রোজেন উপস্থিত থাকতো অবিশুদ্ধরূপে। এতদিন ঐ তরল হাইড্রোজেনকে সরানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু কাপিতজা উদ্ভাবিত যন্ত্রে তরল হাইড্রোজেনবিহীন তরল হিলিয়াম প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

স্বদেশীয় বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণে 1934 সালে কাপিতজা রাশিয়ায় যান। সোভিয়েত সরকার তাঁকে স্বদেশে থেকে স্বদেশের স্বার্থে কাজ করবার অনুরোধ জানান। সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি কাপিতজা। তিনি রাশিয়াতেই থেকে যান। তাঁকে 'সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর সদস্য মনোনীত করা হয় এবং দু'বার 'হিরো অফ সোস্যালিস্ট লেবার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

স্বদেশে ফেরার পর মস্কোয় অবস্থানকালে কাপিতজা পরমাণু-শক্তি নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে অনাগ্রহী ছিলেন বলে তাঁকে সোভিয়েত সরকার কিছুকাল গৃহবন্দী ক'রে রাখেন। পরে নিকিতা ক্রুশ্চেভের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি মুক্তি পান বন্দী দশা থেকে ও স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোর সুযোগ পান।

কাপিতজা তখন বৃদ্ধ কিন্তু অকর্মণ্য নন্। পারমাণবিক শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি মগ্ন। এ ভিন্ন মস্কোয় তাঁর পরিচালনায় রকেটের জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা প্রকল্পের কাজও পুরোদমে চলছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাধনা তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রেরণা জোগাবে চিরকাল।



লিনাস পাউলিং
(1901–   )

প্রথমে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এবং পরে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার গৌরব যে বিজ্ঞানী লাভ করেছেন, তিনি হলেন 'লিনাস পাউলিং'। 1901 সালের 28শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন স্টেটের পোর্টল্যাণ্ডে লিনাস পাউলিং-এর জন্ম হয়। গরীবের ছেলে। বাপ এক ওষুধ প্রস্তুতকারকের কোম্পানীতে সেল্‌সম্যান-এর কাজ করতেন। সামান্য বেতন পেতেন। সংসার চলতো কষ্টেসৃষ্টে।

লিনাস-এর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। লিনাস তখন ন' বছরের বালক। সংসারে বিধবা মা, লিনাস এবং তাঁর দুই ছোট বোন। চারজনের সংসার চলবে কি করে?—বাধ্য হয়ে বালক লিনাসকে রোজগারের চেষ্টা করতে হলো। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর লিনাস বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ পৌছে দিয়ে আসতেন। তাতে সামান্য যা রোজগার হতো তা লিনাস তুলে দিতেন তাঁর মায়ের হাতে সংসার খরচের জন্যে। মা লিনাসকে গল্প শোনাতেন। কি ভাবে লিনাসের দাদামশাই ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়ী হয়েছিলেন, মহামান্য জজরূপে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—এ সব গল্প শোনাতেন। শোনাতেন সাহসিকতার গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার গল্প।

বই পড়তেও খুব ভালবাসতেন লিনাস। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এবং বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে পড়তেন। সব রকমের বই-ই তিনি পড়তেন, তবে বিজ্ঞানের বই-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। তড়িৎ বিজ্ঞানের উপর লেখা বই, যন্ত্রপাতি, গাছপালা, পাথর ইত্যাদি বিষয়ক বই পড়তে খুব ভালবাসতেন তিনি। লিনাসের বিজ্ঞানচর্চায় সাহায্য করতেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু 'লয়েড জেফ্রেস'।

লয়েড বাস করতেন তাঁর কাকা-কাকিমার সঙ্গে। তাঁর কাকা-কাকিমারও বিজ্ঞান প্রীতি কম ছিল না। তাঁরা সময় পেলেই লয়েড আর লিনাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। লয়েডের বাড়িতে লয়েডের কাকা ছোটখাটো একটা রসায়নাগার স্থাপন করেছিলেন। লিনাস ও লয়েড প্রত্যহ সেই রসায়নাগারে গিয়ে একসঙ্গে রসায়ন বিজ্ঞানের নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন।

স্কুলের পড়া শেষ ক'রে লিনাসকে সংসার চালাবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে মেকানিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হলো, কিন্তু মনে মনে তিনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হবার স্বপ্ন দেখতেন। মা তখন খুবই অসুস্থ। ছেলের রোজগারেই সংসার চলে অতি কষ্টে। এমন সময় ছেলে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে বাইরে যাক্—এটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। লিনাস কিন্তু মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে কলেজে ভর্তি হলেন। তাই বলে সংসারের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন না। কলেজের ছুটি হওয়া মাত্রই লিনাস রোজগারের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে পড়তেন। কারও বাড়িতে ঘর মোছার কাজ করতেন, আবার কারও বাড়িতে জ্বালানি কাঠ কাটতেন। এই সব কাজ ক'রে দিনান্তে

যে রোজগার হতো, তা দিয়ে অতি কষ্টে তিনি সংসার খরচ ও নিজের পড়ার খরচ চালাতেন। এই সময় অনেকদিন তাঁকে একবেলা না খেয়ে কাটাতে হতো। বেশির ভাগ দিন রাতে কোন আহারই জুটতো না তাঁর। কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি হলে লিনাস রাস্তা তৈরির ঠিকাদারের ফার্মে চাকরি নিতেন। কুলি-মজুর খাটাতেন, রাস্তা তৈরির তদারকি করতেন। ছুটির দিনগুলিতে রোজগার ভালই হতো।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় এক বিখ্যাত রসায়নবিদের লেখা একটি রচনা পড়ে লিনাস রসায়নবিদ হতে কৃতসংকল্প হন। শুধু তাই নয়, তিনি স্থির ক'রে ফেলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর গঠনের মূল উপাদান অণু-ই হবে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তখনকার দিন পর্যন্ত অণুর ক্রিয়াকলাপ, বিভিন্ন পদার্থে অণুর গঠন ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কলেজের পাঠ সাঙ্গ ক'রে লিনাস পাউলিং ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজিতে শিক্ষকতা ও সেই সঙ্গে গবেষণা করার সুযোগ পান। ওখান থেকেই তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। বিয়ে করেন নিজের এক ছাত্রীকে।

ছাত্রাবস্থাতেই লিনাস বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি বিষয়ের জ্ঞান অপর বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞানকে অনুধাবন করতে সহায়তা ক'রে। এটা বুঝতে পেরে পরবর্তী জীবনে লিনাস পাউলিং মানবদেহের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করতে রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও জীবন বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

গবেষণাকালে পাউলিং অজস্র যৌগ, খনিজ এবং স্ফটিকের গঠন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই সব পদার্থের অণুতে পরমাণুর সজ্জা কি রকম, তা লক্ষ্য করেছিলেন। এ ভিন্ন তিনি 'রাসায়নিক বন্ধন' সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। এই তত্ত্ব থেকে বোঝা যায়, অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি কি ভাবে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। 1939 সালে "রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি" শীর্ষক এক দীর্ঘ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন পাউলিং। বিজ্ঞানী মহলে তাঁর এই গবেষণাপত্রটি সমাদৃত হয়।

এই তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যেই তিনি 1954 সালে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পরবর্তীকালে লিনাস পাউলিং মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ, যথা চুল, রক্ত,

জীবিত কলা ইত্যাদির জটিল অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণুবিন্যাস পর্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখান যে, দেহের রোগগ্রস্থ অংশের অণুর অন্তর্গত পরমাণুগুলির বিন্যাস, সুস্থ দেহের সেই অংশের অণুর মূল পরমাণু বিন্যাস থেকে স্বতন্ত্র। পরমাণু বিন্যাসের এই পার্থক্য পর্যবেক্ষণ ক'রে বহু রোগের কারণ নির্ণয় করা সহজতর হয়। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতার মূলে যে রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ আছে তাও পাউলিং অনুধাবন করেন। তাঁর এই সব গবেষণার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনেকটা বুঝতে পারেন! ভবিষ্যতে এই জ্ঞান মানুষের অনেক রোগ নিরাময়ের সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টির উপর আমেরিকা বর্ষণ করলো পরমাণু বোমা। সেই বোমার ভয়াবহ পরিণতি প্রত্যক্ষ ক'রে লিনাস পাউলিং যৎপরনাস্তি মর্মাহত হলেন। তিনি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলেন না। পরমাণু বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হ'য়ে উঠলেন। তিনি সস্ত্রীক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এবং একাধিক ইউরোপীয় দেশ পরিভ্রমণ করলেন। সর্বত্রই তিনি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে জনমত গঠন করতে লাগলেন। সাধারণ মানুষকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহ মানবদেহের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতিকর। পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিবাদে পাউলিং দেশে-বিদেশে বহু প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করলেন। বিশ্বের সব দেশ থেকেই তিনি এ ব্যাপারে পেলেন সমর্থন। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে এই দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে আমেরিকান সরকার পাউলিংকে ঘন ঘন বিদেশে যাবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করেন নি। তবুও পাউলিং নিরস্ত হন নি। মহান ব্রত নিয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস হিসাবে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই রইলেন। তাঁর এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। 1963 সালের 10ই অক্টোবর তারিখে বিশ্বের পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ সীমিতভাবে বন্ধ রাখতে সম্মত হলেন। আর এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে লিনাস পাউলিংকে 1963 সালে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হলো।

1964 সালে লিনাস পাউলিং 'ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি' থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন মানুষের রোগ দূর করার উদ্দেশ্যে গবেষণা চালাবেন বলে স্থির করেন! এই উদ্দেশ্যে 1973 সালে সান-

ফ্রান্সিসকোতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'লিনাস পাউলিং ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড মেডিসিন' নামে এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে তাঁর বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল প্রকাশ ক'রে তিনি বিশ্ববাসীকে জানান্, যে পুষ্টিকর খাদ্য যে কেবল মানুষের দেহকে রোগমুক্ত রাখে তা নয়, পরমায়ুকেও বাড়ায়। পরিমিত 'ভিটামিন-সি' সেবন করলে সাধারণ সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এটাও লিনাস পাউলিং-এর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।

এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাদর্শ দেশ-বিদেশের সকল বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ডক্টর হিদেকি ইউকাওয়া

(1907—)

যদি প্রশ্ন করা যায় যে, জাপানিদের মধ্যে প্রথম কোন্ বিজ্ঞানী পদর্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান, তাহলে উত্তর হবে "ডক্টর হিদেকি ইউকাওয়া"। হ্যা, ইনিই 1949 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান—পরমাণুর অন্যতম উপাদান 'মেসোট্রন' বা 'মেসন'-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করার জন্যে।

বিশ্বের যে সব বিজ্ঞানী পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন, ডক্টর হিদেকি ইউকাওয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে 1907 সালে হিদেকি ইউকাওয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তাঁর তিন কাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কাজেই জন্মসূত্রে হিদেকি ইউকাওয়া এক উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সন্তান।

ইউকাওয়া কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম. এস.-সি. ডিগ্রী লাভ ক'রে বাবা ও কাকাদের মতো কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ ক'রে কর্মজীবন শুরু করেন। এক বছর সেখানে কাজ করার পর উনি চলে যান জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 1933 থেকে 1938 সাল পর্যন্ত ইউকাওয়া ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও সেই সঙ্গে গবেষণা করেন। সেখান থেকেই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

1935 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পরমাণুর তিনটি মূল উপাদান—ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের কথাই জানতেন, কিন্তু 1935 সালেই তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী হিদেকি ইউকাওয়ার গবেষণার ফলে পরমাণুর অভ্যন্তরে 'মেসন' নামক চতুর্থ উপাদানটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

ইউকাওয়া বলেন, ঐ অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি অর্থাৎ মেসন কণাগুলি পরমাণুর কেন্দ্রীণে (নিউক্লিয়াসে) অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন-এর মধ্যে তীব্র বন্ধনশক্তি যোগায়। তাঁর বক্তব্য তখনকার বিজ্ঞানীরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি, কিন্তু ইউকাওয়া যখন গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করেন, তখন বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে তাঁর আবিষ্কার স্বীকৃতি পায়? ইউকাওয়ার

তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নতুন ঐ কণাগুলির ভর প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভরের মাঝামাঝি হওয়া উচিত। গ্রীক শব্দ 'mesos'-এর অর্থ মাঝামাঝি। তাই ইউকাওয়া কর্তৃক আবিষ্কৃত ঐ নতুন কণাগুলি তখন থেকে 'মেসন' নামে পরিচিত হয়। আর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটির জন্যেই ডক্টর ইউকাওয়া পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। পরমাণুর চতুর্থ উপাদান বা 'মেসন' আবিষ্কার ক'রে ইউকাওয়া বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত হ'য়ে ওঠেন।

ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন-এর মতো মেসনও একটি 'সাব অ্যাটমিক পার্টিকল'। ডক্টর ইউকাওয়া মেসন কণার তাত্ত্বিক অস্তিত্ব প্রমাণ করার এবং তার সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রীণে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন কণার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন-শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করার দু' বছর পরে আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানী 'কার্ল অ্যাণ্ডারসন' মহাজাগতিক রশ্মিতে (কসমিক-রে) মেসন কণার অস্তিত্ব নিরূপণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে মেসন কণা ইলেকট্রন কণার চেয়ে প্রায় দু'শো গুণ ভারী।—এ ভবিষ্যদ্বাণী ইউকাওয়া অবশ্য তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণার পরই করেছিলেন। এখন অ্যাণ্ডারসনের পরীক্ষায় তার সত্যতা প্রমাণিত হলো।

এর দশ বছর বাদে বৃটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী সি. এফ. পোওয়েল দু' রকম মেসন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এদের একটি হলো 'পাই-মেসন' বা 'পাইয়ন' এবং অপরটি 'মিউ-মেসন' বা 'মিউয়ন'। পোওয়েল-এর পরীক্ষায় এও প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টির বা জন্মের 10^{-8} সেকেণ্ডের মধ্যেই পাইয়ন-এর আয়ু শেষ হ'য়ে যায়। নিস্তড়িৎ পাইয়ন-এর অস্তিত্বও তিনি প্রমাণ করেন। নিস্তড়িৎ পাইয়নেরা আবার আরও বেশি ক্ষণস্থায়ী। আয়ুষ্কাল মাত্র 10^{-16} সেকেণ্ড। আয়ুষ্কাল কম হলে কি হবে, এদের গতিবেগ কিন্তু খুব বেশী।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে মেসন কণিকাদের আধান ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে। আবার নিস্তড়িৎ মেসন কণিকাও আছে। সব রকমের মেসন কণাই পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন কণাদের মধ্যে তীব্র বন্ধনশক্তি যোগায়। সাগর,সমতলের বায়ুমণ্ডলে প্রাপ্ত মেসনের ভর ইলেকট্রনের ভরের 210 গুণ এবং এদের গড় আয়ুষ্কাল 2×10^{-6} সেকেণ্ড মাত্র। এরা 'মিউ-মেসন'। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে আর এক রকম মিউ-মেসন-এর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের ভর ইলেকট্রনের ভরের 276 গুণ এবং গড় পরমায়ু 2.6×10^{-8} সেকেণ্ড। মহাজাগতিক রশ্মিতে আরও দু' রকম মেসন কণার

(τ-মেসন এবং θ মেসন) অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে এই সব মেসন কণিকারা মহাশূন্য থেকে অহরহ ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হচ্ছে।

মেসন কণা আবিষ্কারের পর ডক্টর ইউকাওয়া পারমাণবিক শক্তিতত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল সূত্র সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকালে সেখানকার বিজ্ঞানীদের কাছে ডক্টর ইউকাওয়া তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার বিষয়ে অজস্র বক্তৃতা দেন।

1939 সালে ইউকাওয়া আবার ফিরে আসেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে তিনি যোগ দেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে—পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে।

নোবেল পুরস্কার লাভের আগেই 1948 সালে ডক্টর ইউকাওয়া নিউজার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিট্যুট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ'নামক প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং প্রফেসর রূপে আমন্ত্রিত হন। 1949 থেকে 1953 সাল পর্যন্ত তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন।

ডক্টর ইউকাওয়ার সম্পাদনায় 'প্রগ্রেস অফ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে। ঐ পত্রিকায় তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের বহু দুরূহ তত্ত্বের উপর মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হন। 1940 সালে 'জাপানি অ্যাকাডেমি' তাঁকে 'ইম্পিরিয়াল প্রাইজ' দিয়ে সম্মানিত করেন। তারপর 1943 সালে তিনি লাভ করেন আর এক দুর্লভ সম্মান 'অর্ডার অফ ফেডারেশন অফ জাপান'। ডক্টর ইউকাওয়া জাপানি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্য, আবার আমেরিকান 'ফিজিক্যাল সোসাইটির'-ও ফেলো। এ ভিন্ন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত।



গ্লেন সীবর্গ

(1912—   )

প্লুটোনিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়াম, ফারমিয়াম, বারকেলিয়াম ইত্যাদি মৌলগুলির নাম আমাদের অজানা নয়। এই মৌলগুলিকে কৃত্রিম মৌল বা ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলও বলা হয়।

কৃত্রিম মৌল বলতে আমরা বুঝি সেই সব মৌলকে—কৃত্রিম উপায়ে যেগুলিকে পরীক্ষাগারে তৈরি করা সম্ভব হয়। এই মৌলগুলিকে আবার ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল বলার কারণ হলো এই যে, এগুলিকে মৌলের পর্যায়

সারণীতে ইউরেনিয়ামের পর স্থান দেওয়া হয়েছে।—এই কৃত্রিম মৌলগুলির আবিষ্কর্তা কে, এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্লেন সীবর্গ এই রকম আটটি কৃত্রিম মৌল আবিষ্কার করেছেন। সেই মৌলগুলির পরমাণু ক্রমাঙ্ক যথাক্রমে 94 থেকে 101।

এখানে 'পরমাণু ক্রমাঙ্ক' কথাটির একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। সব পরমাণুরই কেন্দ্রস্থলে থাকে 'নিউক্লিয়াস' বা পরমাণু কেন্দ্রীন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন নামে দু' রকমের প্রাথমিক কণা থাকে। প্রোটনগুলি ধনাত্মক আধানে আহিত কণা আর নিউট্রনগুলির কোন তড়িৎ আধানই নেই।

পরমাণুর গঠনের সঙ্গে সৌরজগতের গঠনের খানিকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সৌর জগতের কেন্দ্রস্থলে যেমন থাকে সূর্য, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে থাকে নিউক্লিয়াস। গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে আপন আপন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। গ্রহদের মতো ইলেকট্রনেরাও পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র ক'রে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে। ইলেকট্রনেরা ঋণাত্মক তড়িৎ আধানে আহিত কণা। 'পরমাণু ক্রমাঙ্ক' বলতে আমরা বুঝি—পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত মোট 'প্রোটন' সংখ্যাকে। 'প্লুটোনিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 94' বলতে আমরা বুঝি—ঐ মৌলটির নিউক্লিয়াসের ভেতরে মোট 94টি প্রোটন আছে।

বিজ্ঞানী সীবর্গ যে আটটি কৃত্রিম মৌল আবিষ্কার করেছেন, পরমাণু ক্রমাঙ্কসহ তাদের নাম নীচে দেওয়া হলো।

প্লুটোনিয়াম — 94	ক্যালিফোর্নিয়াম—98
আমেরিসিয়াম— 95	আইনষ্টাইনিয়াম—99
কিউরিয়াম — 96	ফার্মিয়াম — 100
বারকেলিয়াম — 97	মেণ্ডেলিভিয়াম—101

102 পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌলটি (যার বর্তমান নাম নোবেলিয়াম) সীবর্গ আবিষ্কার না করলেও 1958 সালে এটিকে তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। সীবর্গ আরও ছ'টি কৃত্রিম মৌল আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে লরেন্সিয়াম, যার পরমাণু ক্রমাঙ্ক 103.

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগানের অন্তর্গত ইশপেমিং শহরে 1912 সালে গ্লেন সীবর্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ঐ শহরেই যন্ত্রবিদের কাজ করতেন। জন্মসূত্রে সীবর্গের বাবা ছিলেন সুইডিশ। সুইডেন ছেড়ে তিনি চলে আসেন

ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এবং সেইখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন।

গরীবের ছেলে সীবর্গকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ছেলেবেলা থেকেই কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় ধনীর বাগানে মালির কাজ করে, ফলের বাগিচা থেকে ফল তুলে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাল সরবরাহ করে তিনি যে অর্থোপার্জন করতেন, তাই দিয়ে নিজের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন।

সীবর্গের স্বাস্থ্যটি ছিল সুন্দর এবং ব্যক্তিত্ব ছিল মনোরম। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি ছাত্র-নেতা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1934 সালে সীবর্গ স্নাতক হন। তিন বছর বাদে 1937 সালে তিনি বার্কলি বিশ্বিদ্যালয়ে ভর্তি হন পি. এইচ. ডি. করবার জন্যে। 1940 সালে প্লুটোনিয়াম নামক কৃত্রিম মৌলটি আবিষ্কার ক'রে সীবর্গ রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে ওঠেন। কিছুকালের মধ্যেই পরমাণু বিভাজনের জ্বালানি হিসাবে প্লুটোনিয়ামের কার্যকারিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। অমনি বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে যায়। শুরু হয় –এই কৃত্রিম মৌলটিকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার ক'রে পারমাণবিক বোমা বানাবার তোড়জোড় পড়ে গিয়েছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ফার্মি, সীবর্গ প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ডেকে পাঠিয়ে পরমাণু বোমা বানাবার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা চালাবার নির্দেশ দিলেন। 'মানহাট্টান প্রজেক্ট' ভবনে গড়ে উঠলো পারমাণবিক গবেষণাগার। অবশ্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সেই গবেষণাগারের নাম দেওয়া হলো 'ধাতু বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র'। লোকে ভাবতেই পারলো না যে সেই ভবনের ভেতরে শুরু হয়ে গেছে ভয়াবহ এক মারণাস্ত্র বানাবার প্রস্তুতিপর্ব। সীবর্গ মনে প্রাণে বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণে ও শান্তির কাজে নিয়োজিত করার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সরকারী চাপের কাছে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হলো। বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে লাগাবার গবেষণায় নিযুক্ত হতে হলো বাধ্য হ'য়ে।

আমেরিকার সেরা বিজ্ঞানীদের এই সমবেত প্রচেষ্টা অবশেষে একদিন সফল হলো। তৈরি হলো আধুনিক কালের সর্বাধুনিক ও ভয়াবহ মারণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টির উপর পর্যায়ক্রমে দু'টি পারমাণবিক বোমা ফেলে শহর দু'টিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে দেওয়া হলো। লক্ষ লক্ষ মানুষ ও অন্যান্য

প্রাণি প্রাণ হারালো সেই ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে। কিছু মানুষ; যারা প্রাণে বাঁচলো—তারা রইলো বিকলাঙ্গ ও জীবন্মৃত হ'য়ে।

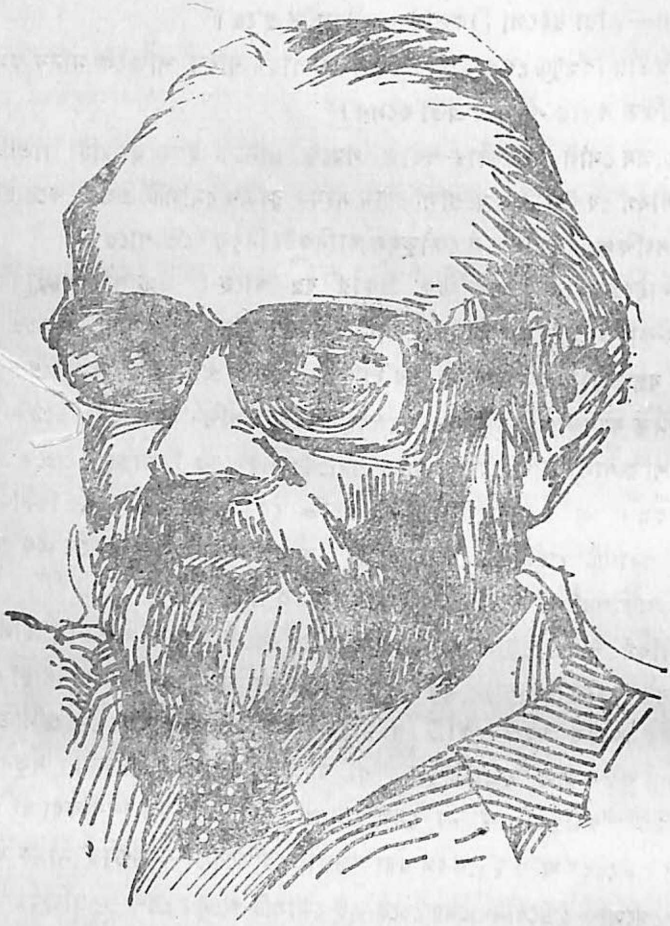
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে পর সীবর্গ পারমাণবিক শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার সাধনায় ব্রতী হলেন।

কৃত্রিম মৌল আবিষ্কার-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে হওয়াটা স্বাভাবিক। গ্লেন সীবর্গ যে উপায়ে মেণ্ডেলিভিয়াম নামক কৃত্রিম মৌলটি প্রস্তুত করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে কৌতূহল খানিকটা নিবৃত্ত হতে পারে।

'সাইক্লোট্রোন' নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে। উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকা (যেমন আল্‌ফা কণা, প্রোটন ইত্যাদি) উৎপাদনের জন্যে এই জটিল যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এর যান্ত্রিক কৌশলে প্রচণ্ড গতি সঞ্চারণের ফলে আয়নিত কণিকাগুলি লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি-বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই রকম শক্তিশালী কণিকার আঘাতে পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হয়। এ ভাবে সোডিয়াম প্রভৃতি কোন কোন পদার্থের বিভাজনের ফলে পদার্থটি তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মৌলের রূপান্তর ঘটে।

সীবর্গ সাইক্লোট্রোন যন্ত্র থেকে তীব্র বেগে আল্‌ফা কণিকা (হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস) বর্ষণ করেন। লক্ষ্য বস্তু ছিল—আইনস্টাইনিয়াম মৌলের কয়েক সহস্র কোটি পরমাণু। এই প্রক্রিয়ার ফলে মেণ্ডেলিভিয়াম মৌলের কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা বা পরমাণু পাওয়া গেলো। নতুন এই মৌলটির পরমাণুগুলিকে না গেল চোখে দেখা, না গেল স্পর্শ করা বা ওজন করা। এদের অস্তিত্ব কেবল ধরা পড়লো 'রেডিয়েসন কাউণ্টার' নামক যন্ত্রে। জানা গেলো—ইউরেনিয়ামের চেয়ে এই মৌলটি অনেক বেশী তেজস্ক্রিয়।

এই রকম অভিনব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্যে এডুইন ম্যাক্‌মিলান-এর সঙ্গে সীবর্গ যুগ্মভাবে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন 1951 সালে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে সীবর্গকে পঞ্চাশ হাজার ডলার 'এনরিকো ফার্মি' পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁকে বার্কলিতে অবস্থিত তেজোরশ্মি গবেষণাগারের যুগ্ম অধিকর্তা পদে নিয়োগ করা হয়। 1958 সালে সীবর্গ বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদে উন্নীত হন। 1961 সালে তাঁকে আমেরিকার পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়। আমেরিকার সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে গ্লেন সীবর্গ যে অন্যতম, সে কথা আজ সর্বজন বিদিত।



আবতুস সালাম

(1926—   )

পনেরই অক্টোবর 1979 সাল, সোমবার। 'সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্স' থেকে সেদিন ঘোষণা করা হলো যে 1979 সালে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পাবেন তিনজন বিজ্ঞানী। সেই তিন কৃতী পদার্থ বিজ্ঞানীর মধ্যে পাকিস্তানের অধ্যাপক আবতুস সালাম অন্যতম। এই প্রথম একজন পাকিস্তানী নোবেল পুরস্কার পেলেন।

পাকিস্তানের লাহোর শহরের তু'শো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে 'ঝাঙ'

নামে এক শহরে আবদুস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসন 1926 খ্রীষ্টাব্দ। শৈশবকাল থেকেই সালাম লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন। স্কুল ও কলেজে পড়ার সময় তিনি কতকগুলি বিষয়ে খুব বেশী নম্বর পেয়ে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন, আজও সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র সে রেকর্ড ভঙ্গ করতে পারে নি।

সালামের ইচ্ছা ছিল যে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। লাহোর থেকে অঙ্ক শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেই সালামকে চলে যেতে হয় ইউনাইটেড কিংডমে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের সময় তিনি ডিরাক প্রমুখ প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীদের অধ্যাপকরূপে পান। সালামের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে বুঝতে পেরে ডিরাক তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানী হবার পরামর্শ দেন। সে পরামর্শ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সালামের সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার স্বপ্নেরও সমাধি ঘটে।

একত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করবার আগেই সালাম রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। 1957 সাল থেকে তিনি লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির' তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। এ ভিন্ন ইটালীর ত্রিয়েস্তেতে অবস্থিত 'ইনটারন্যাশনাল সেণ্টার অফ্ থিওরেটিক্যাল্ ফিজিক্স'-এর তিনি ডিরেক্টর। তাঁরই উদ্যোগে এই বিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে।

এবারে আসা যাক্ সালামের গবেষণা প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে যে 1979 সালে আবদুস সালাম ও অপর দু'জন মার্কিন পদার্থ বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সম্মিলিতভাবে। সেই দু'জনের মধ্যে একজন হলেন অধ্যাপক স্টিভেন ভিন্‌বার্গ, অন্যজন অধ্যাপক শেলডান এল গ্লাশো। পদার্থ বিজ্ঞানে যে অনন্যসাধারণ কাজের জন্যে এই তিন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, বিজ্ঞানীদের ভাষায় তা 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী' বা একক ক্ষেত্র তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তুকণা থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির সৃষ্টি, রূপান্তর ও কার্যকলাপের মূলে আছে চার রকম মৌলিক বল বা ফোর্স। এই চার রকম বলের মধ্যে প্রথমটি হলো মহাকর্ষ বল, দ্বিতীয়টি 'স্ট্রং ফোর্স' বা প্রবল বল, তৃতীয়টি তড়িৎ চৌম্বক বল এবং চতুর্থটি হলো 'উইক ফোর্স' অর্থাৎ কিনা মৃদু বল।

যে শক্তির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহনক্ষত্রাদি পরস্পরকে এবং বস্তুনিচয়কে তাদের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে তার নাম 'মহাকর্ষ বল'। পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াসে অর্থাৎ কেন্দ্রীণে প্রোটন ও নিউট্রন কণাগুলি যে বলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, তার নাম 'স্ট্রং ফোর্স' বা প্রবল বল। তড়িৎ ও চৌম্বক শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দরুণ যে ধরনের বলের সৃষ্টি হয়, তার নাম তড়িৎ-চৌম্বক বল। আর যে শক্তির সাহায্যে কোনও মৌলিক পদার্থ তার অন্তর্নিহিত শক্তির ক্ষরণ ঘটিয়ে (বিটা রশ্মি ত্যাগ করে) ভিন্নতর পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তাকে বলা হয় 'মৃদু বল'।

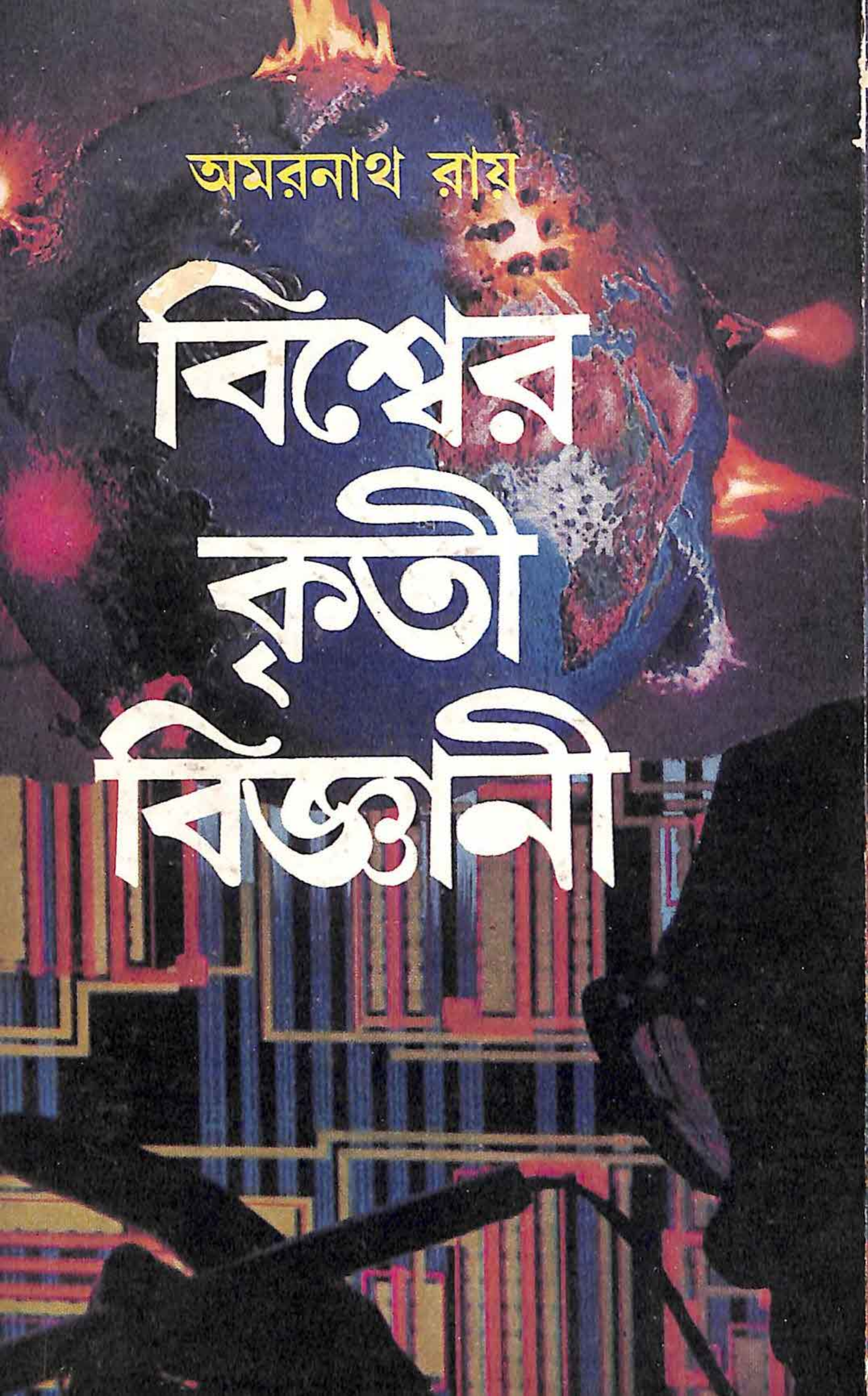
আপাত দৃষ্টিতে এই চারটি বলের পৃথক সত্তা আছে বলে মনে হয়, কিন্তু বিজ্ঞানীদের ধারনা যে এই চার রকম বলের উৎস হয়তো একই। প্রত্যেক রকম বলের প্রভাব এক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর বা ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের অনেক প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীই এই চার রকম বলের ক্ষেত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে এসেছেন। তাঁদের সবারই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল একটাই এবং সেটা হলো এমন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যার দ্বারা প্রমানিত হবে যে পূর্বোক্ত চার রকম বলের ক্ষেত্রকে পৃথক পৃথক সত্তা হিসাবে মনে হলেও আসলে তারা একই সত্তার চতুর্মুখী প্রকোশ।—এই তত্ত্বটিকেই বিজ্ঞানীরা আখ্যা দিয়েছেন 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' বা 'একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব'। এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষের দিকে বেশ কয়েক বছর প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন কিন্তু সফল হন্ নি। এ কাজে পর-বর্তীকালে আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন আবদুস সালাম এবং তাঁর সতীর্থ দুই মার্কিন বিজ্ঞানী। পরমাণুর কেন্দ্রে যে দুর্বল বল বা মৃদুবল সক্রিয় আছে, তার চরিত্র যে তড়িৎ-চৌম্বক বলেরই মত—সালাম, ভিনবার্গ ও গ্লাশো তাঁদের তত্ত্বে সেটাই বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন এবং শেষোক্ত বিজ্ঞানী তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে চার রকম বলের মধ্যে দু' রকম বলের একীকতে ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এঁরা তিনজনে একত্রে সম্মানিত হয়েছেন নোবেল পুরস্কারে। সালামের আর এক কৃতিত্ব হলো 'ওমেগা মাইনাস' নামে এক রকম মৌল কণা আবিষ্কার।

1981 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক সালামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ

জানান। অধ্যাপক সালাম একটি শর্তে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হন। সেই শর্তটি হলো—কলকাতায় আছেন তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক শ্রী অনিলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে আগে বিশ্ববিদ্যালয়-এর তরফ থেকে সম্মানিত করতে হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই শর্ত মেনে নিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মানিত করেন। তারপর সালাম আসেন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে এসে প্রথমেই তিনি সাক্ষাৎ করেন তাঁর গুরু শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে পাওয়া নোবেল পদকটি শিক্ষাগুরুকে দেখান। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নেন। তারপর বলেন, "স্যার লাহোর কলেজে আপনার কাছ থেকে অঙ্ক শাস্ত্র যেটুকু শিখেছিলাম কেম্ব্রিজে গিয়ে তার থেকে বেশী কিছু শিখতে পারিনি।"

—এ যুগে এ রকম গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।


অমরনাথ রায়
বিশ্বের
কৃতী
বিজ্ঞানী